হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, April 2015

''মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ বলে একটি নির্দেশ আছে। এই নির্দেশ অনুসারে মুসলিম শাসকদের সব দেশগুলোকেই মুসলিম শাসনের অধীনে নিয়ে আসার অধিকার দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না পৃথিবীর সব দেশ ইসলামের শাসনাধীনে আসে।''

—বি আর আম্বেদকর

রামনবমীর মিছিল ঃ গ্রেপ্তার দুই

মহরমের দিন মুসলমানদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল করতে দেখেছেন? তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত একজন মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে শুনেছেন? রাম নবমী উপলক্ষে হিন্দুদের মিছিল হল বারুইপুরে। কোন সংঘর্ষ, দাঙ্গা হয়নি। শুধুমাত্র অস্ত্রসহ মিছিল করা হয়েছে, এই অপরাধে হিন্দুদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে—এই দাবীতে মুসলমানরা রেল অবরোধ করলো। মুসলমানদের দাবী না মানলে তো দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমর্তি মাটিতে মিশে যায়! তাই গ্রেপ্তার করা হল হিন্দু সংহতির কর্মী তপন আর ভি এইচ পি কর্মী অনন্তকে। শুনলাম মুসলমানেরা বারুইপুরের এসডিপিও-র অপসারণের সাথে সাথে এখানে মুসলমান এসডিপিও নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। মুসলমানেরা খুল্লমখুল্লা সাম্প্রদায়িক দাবি জানালে ধর্মনিরপেক্ষতার গায়ে আঁচড় লাগে না। তারা ধর্মের ভিত্তি দেশভাগ করতে চাইলেও পেয়ে যায়! কিন্তু এদেশের মাটিতে হিন্দুদের ধর্মপালনের স্বাধীনতা নেই। এটাই সত্য। তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার দায়িত্ব কি শুধু হিন্দুদের? এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার যূপকাষ্ঠে কি শুধু তপন-অনন্তদেরকেই বলি দেওয়া হবে? ধিক্কার জানাই এই ধর্মনিরপেক্ষতার দালালদের। ধিক্কার জানাই স্বাভিমানহীন হিন্দুদের, যাদের বাড়িতে আগুন লাগে, দোকানে আগুন লাগে, মা-বোনের ইজ্জতে আগুন লাগে কিন্তু কখনও রক্তে আগুন লাগে না।

সংহতি কর্মীদের চেষ্টায় নাবালিকা উদ্ধার

আবার হিন্দু সংহতি কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার হল লাভ জেহাদের শিকার এক নাবালিকা। ঘটনা মালদা জেলার কালিয়াচকের। গত ৩ মার্চ রাতে নিজের বাড়ির বাইরে থেকে সোনালি গুপ্ত (নাম পরিবর্তিত) কে অপহরণ করে স্থানীয় মোস্তাফা ও ছোটন। ৪ঠা মার্চ সোনালির বাবা কালিয়াচক থানায় অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করেন। যথারীতি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না সোনালির। এরপর অপহৃতার বাবা হিন্দু সংহতির শরণাপন্ন হলে সংহতির কর্মীরা কালিয়াচক থানা ঘেরাও করে প্রশাসনের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ সক্রিয় হয় এবং ১৫ মার্চ সেই নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়।

মতুয়াদের শোভাযাত্রায় হামলা, শ্লীলতাহানি

বিনা প্ররোচনায় মতুয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শোভাযাত্রার উপর হামলা চালাল মুসলমান দুষ্কৃতিরা। উঃ ২৪ পরগণার দত্তপুকুর থানার চালতাবেড়িয়া বিদ্যাসাগর পল্লীর ঘটনা। গত ২রা মার্চ মতুয়াদের একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা চলাকালীন স্থানীয় মুসলমানরা এর উপর চড়াও হয়। প্রায় ২০০-২৫০ জন দুষ্কৃতি ধর্মপ্রাণ মতুয়া সম্প্রদায়ের ঐ মিছিলকে আক্রমণ করে যথেচ্ছভাবে গালিগালাজ, মারধোর করে ও মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে বলে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও জমি দখল করে রাস্তা নির্মাণ ডায়মন্ডহারবারে

ডায়মন্ডহারবারে সিআইডি অফিসের নাকের ডগায় সরকারি জমির উপর অবৈধ নির্মাণ চলছে। সেবা নার্সিংহোমের ঠিক উল্টোদিকে নয়ানজুলির উপরে তৈরি হচ্ছে কালভার্ট। নেপথ্যে ল্যান্ড জেহাদের কাহিনী। রহিতাস্য সরদার এবং মধুসূদন ভাণ্ডারীর ব্যক্তিগত জমি (দাগ নং ৩৫৩ মাখালহাট মৌজা এবং দাগ ন-৬৩৯ হরিণডাঙা মৌজা)-র উপর দিয়ে জোর করে রাস্তা তৈরির অপচেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় মুসলিম সমাজ। রহিতাস্য বাবুদের জমির পিছনে একটি জমিতে ইতিমধ্যে বানানো হয়েছে কবরস্থান। সেই কবরস্থানে যাওয়ার রাস্তার জন্য গায়ের জোরে এই জমি দখলের চেষ্টা। রহিতাস্যবাবুরা আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন নিজেদের পক্ষে। কিন্তু আইনের তোয়াক্কা এদেশের মুসলমানেরা কোনোদিন করেছে কি? আদালত পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল দাঁড়িয়ে থেকে মালিককে জমির দখল পাইয়ে দিতে। রহিতাস্যবাবু দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পুলিশের দপ্তরে পুলিশ পিকেট বসানোর জন্য আবেদন করে ২১,০০০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও কার্যকরী সহায়তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই অবৈধ কালভার্ট তৈরি হয়ে যাবে। আরও একবার মুসলিম আগ্রাসন বিজয়ী হবে এই মাটিতে। সেই তপনদার কথাই সত্যি—জমি কখনও বাপের হয় না, জমি হয় দাপের (দাপটের)।

জেলায় জেলায় সাড়ম্বরে পালিত হলো রাম জন্মোৎসব

২৮ মার্চ ছিল যুগপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রর জন্মদিন। জেলায় জেলায় উৎসাহের সঙ্গে পালিত হল রামনবমী। হিন্দু সংহতির উদ্যোগেও বিভিন্ন জেলায় রামপুজো অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুষোত্তম, অযোধ্যার রাজা ভক্তের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুজো হিন্দু সংহতির উদ্যোগে হাওড়া জেলা জুড়ে অনুষ্ঠিত হল। সংহতি সভাপতি এই উপলক্ষে হাওড়া জেলা ভ্রমণ করেন। সাঁকরাইল হিন্দু সংহতির কর্মী সহদেবের উদ্যোগে বড় করে রামপুজো হয়। সেখানে একটি স্থায়ী রামন্দিরও তৈরি করা হয়েছে। মৌড়ীগ্রামে স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডে প্রতিবারের মতো এবারও সংহতির কর্মীরা পুজোর আয়োজন করে। সন্ধ্যায় একটি ধর্মীয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করে সভ্যরা। সেখানে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তপন ঘোষ তার বক্তব্যে বলেন, রামের জীবনকথা ও আদর্শ আজকের শিশু থেকে যুবকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। ধর্মাচারণ করতে হলে আগে ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। রামচন্দ্র ধর্মরক্ষা করেছিলেন, তবে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠরা ধর্মাচারণ করতে পেরেছিলেন। তাই আজকের যুব সমাজ ধর্মরক্ষায় মন দিক আর হিন্দু সংহতির কর্মীরা তাই করছে বলে তিনি মনে করেন।

বাগনানে মুকুন্দ কোলে, সুবীর ধাড়া-র নেতৃত্বে রাম শোভাযাত্রা বের হয়। সেখানে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

হাওড়া জেলায় মুসলমান দুষ্কৃতিদের তাণ্ডব

হাওড়া জেলার বাগনান থানার জোকা গ্রামে গত ১৯ ফেব্রুয়ারী কালীপূজা উপলক্ষে আট দলীয় পাওয়ার বল প্রতিযোগিতা চলছিল রাত্রিকালীন। ঐ খেলাতে কোন মুসলমান দল ছিল না। ঐ কালী পূজা এবং খেলা ছিল থানার অনুমোদনে। খেলা চলাকালীন পাশের খাদিনান গ্রামের মস্তান সেখ অন্তু, বুবাই খাঁ, সেখ করিম, সেখ বাদশা, জোকা গ্রামের সেখ মতি, সেখ লখিন, সেখ ফিরোজ, অম্বর সেখ, সেখ বচ্চন, সেখ শাহিদকে নিয়ে খেলার মাঠে ঝামেলা করতে যায়। প্রথম দুইবার তাদের বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেয়, তৃতীয় বারে জনসাধারণ খেপে গিয়ে মারধোর করে পাঠিয়ে দেয়। থানাতে খবর পাঠালে থানা থেকে পুলিশ এসে খেলা বন্ধ করে দেয়। স্থানীয় কয়েকজন বাদে সকলেই চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ রাত্রি ২.৩০ মিঃ নাগাদ পাশের হনুমান মন্দিরে ঐ সমস্ত মুসলমান দুষ্কৃতিরা ভাঙচুর করে। এবং থানায় গিয়ে তাপস ঘাঁটা, প্রেম দেঁড়ে, মাধব মাইতি, পবিত্র মাইতির নামে কেস করে। কেস নং ৭১/১৫, ১৯-২-১৫ ধারা হল ৩৪১, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৮৯, ৩৪, ৫০৬। ঐদিন রাত্রে তাপস ঘাঁটাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরের দিন ৩০০ জনের মতো লোক থানায় গিয়ে ঐ সমস্ত মুসলমান দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করতে গেলে পুলিশ কোনরকম এফ.আই.আর তো দূরের কথা ডাইরি পর্যন্ত নেয়নি। ঘুরিয়ে সকলকে থানায় ভরে দেবে বলে ধমকায়। তাপস ঘাঁটাকে উলুবেড়িয়া কোর্টে তুললে জামিন খারিজ করে দেয়। জোকা গ্রামটি দীর্ঘদিন ধরে হিন্দু সংহতির যুক্ত। এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঐখান থেকে একটি গাড়ি ভর্তি লোক যায়।

স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষাকারী সামাজিক সাম্যের অক্লান্ত যোদ্ধা ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর-এর ১২৬ তম জন্মদিবসে (১৪ই এপ্রিল) বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

হিন্দু সংহতি

আমাদের কথা

পশ্চিমবঙ্গে শরিয়তি আইন ঃ বুদ্ধিজীবিরা চুপ কেন

লজ্জা। কলঙ্কজনক। একই সঙ্গে আতঙ্ক ও ভয়ের। পশ্চিমবঙ্গের বুকে ইসলামিক আগ্রাসন কতদূর পর্যন্ত শেকড় গেড়েছে, তার নমুনা দেখতে পাওয়া গেল মালদা জেলার চাঁচলে। স্বাধীন ভারতের এই অঞ্চলে শরিয়তি আইন বলবৎ হয়েছে। যেমনভাবে চলতো মধ্যযুগে। গণতান্ত্রিক দেশ ভারত। এখানে উচ্চনাদে ধর্মনিরপেক্ষতার ঢাক পেটানো হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ভারতীয় আইনকে কেয়ার করে না—তার নমুনা অনেক আছে। সম্প্রতি চাঁচলের হরিশ্চন্দ্রপুরের চণ্ডীপুরে মহিলাদের একটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মৌলবীরা যে ফতোয়া জারি করলো তা সত্যিই বিস্ময়কর। আঁটোসাঁটো পোষাক পরে মহিলাদের খেলা শরিয়তে মানা আছে। এই কারণ দেখিয়ে প্রশাসনকে তারা ফুটবল ম্যাচটি বাতিল করতে বাধ্য করে। প্রশাসন তো বরপুত্রদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সবসময়ে তৈরি। তাই ম্যাচ বাতিল করে শান্তিরক্ষা করতে তারা এক মুহূর্তও দেরি করেনি।

প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপ থাকে। এখানেও ছিল। ম্যাচ বন্ধের দাবী নিয়ে মৌলবীদের সঙ্গে রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যা শাম্মি আখতার হরিশ্চন্দ্রপুর বিডিও-র কাছে গিয়েছিলেন। এ হেন অন্যায় কাজ করার পরও সিপিএম, বিজেপি বা কংগ্রেস শাম্মি আখতারের বিরুদ্ধে একটিও কথা বলেন নি। আসলে ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবে সকলেই মৌনী নেওয়াই উচিত মনে করে। তার উপর পৌরসভার ভোট দ্বারে এসে খট্ খটাচ্ছে। এমন অবস্থায় মৌলবীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে নিজের রাজনৈতিক ফায়দা নষ্ট করতে চায় না কোন রাজনৈতিক দল। তা সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা বা আইনি ব্যবস্থার উপর যত বড় আঘাতই হোক না কেন।

এবার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের কথায়। একটি বাংলা জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকায় বিষয়টি ফলাও করে ছাপা হয়। এত বড় ঘটনাটা হয়তো তাদের চোখেই পড়েনি। হয়তো অনেকে বলবে, 'তাই নাকি? আমার তো জানা ছিল না।' কিন্তু এদেরই অনেকে গাজায় ইজরাইলি হানার প্রতিবাদে শোকাশ্রু ফেলতে ফেলতে ধর্মতলার মিছিলে পা মেলাবে। পঞ্চমুখে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার নিন্দা করবে। মিজোরামে ধর্ষক খুনের প্রতিবাদে ফেটে পড়বে, রাস্তায় নেমে বিচার চাইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শরিয়তি আইনের দোহাই দিয়ে মৌলবীরা মহিলাদের ফুটবল ম্যাচ বন্ধ করে দিলেও এদের মুখ দিয়ে একটাও কথা বের হবে না। বুদ্ধিজীবী তো আমরা তাদেরকেই বলবো, যারা সমাজকে সঠিক দিশা দেখাবে। যাদের চিন্তনধারা মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটাবে। এমন বুদ্ধিজীবী একদিন বঙ্গে ছিল বলে গোখলে বলেছিলেন—বেঙ্গল থিঙ্কস্ টুডে ইন্ডিয়া থিঙ্কস্ টুমরো। আর আজ। নির্বুদ্ধিজীবীর দল তাদের আসন আলো করে বসে আছে। পশ্চিমবঙ্গে তো এখন সেলিব্রিটিরাই বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত। নাম-যশই এখানে বুদ্ধির পরিচায়ক। গরীব স্কুলমাস্টার এখানে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পড়েন না অথচ মোটা দাগের সেলিব্রিটি অনায়াসে সেই গোত্রে পড়েন। যেখানকার সুশীল সমাজ স্বার্থপর, অপদার্থ ও হীনমানসিকতার সেখানে অন্যায়কারীরা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু এখনও কি ভাববার সময় আসেনি, কোথায় চলেছি আমরা। আজ চাঁচলে যা ঘটেছে তা আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও ঘটবে। তারপর অন্য কোথাও। প্রতিবাদ না হলে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। একবারও কি ভেবে দেখেছেন সেদিন আমাদের ঘরের মেয়েদের কী অবস্থা হবে। খেলাধূলা তো দূরের কথা, তাদের স্বাধীনভাবে চলাফেরাও অসম্ভব হয়ে উঠবে। মেরি কম, সানিয়া মির্জা, সাইনা বা সিন্ধু জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। খেলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাদের খাটো ও আঁটোসাঁটো পোশাক পড়তে হয়। ভারতের জাতীয় মহিলা হকি দল বা ফুটবল দল সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। শুধু শরিয়তি আইনে মানা আছে বলে এদের খেলাধূলাকে বন্ধ করে দিতে হবে? ভারতের মতো উন্নত দেশের একটি রাজ্যে এ মেনে নেওয়া কী সম্ভব? কিন্তু এখনই যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে একদিন বাধ্য হয়েই তা মেনে নিতে হবে। যেমনভাবে আরব দুনিয়ায় জোর করে মেয়েদের তা মানতে বাধ্য করা হয়। সেখানেও অনেক মহিলা প্রতিভা আছে। কিন্তু ধর্মীয় নাগপাশে বাঁধা পড়ে তারা ছট্‌পটাচ্ছে। ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে তারা ধর্মের বেড়াজাল। আর আমরা কিছু পাওয়ার স্বার্থের লোভে পৃথিবীতে ব্রাত্য শরিয়তি আইনকে ডেকে আনছি নিজেদের ঘরে। এর পরিণাম কী ভয়ংকর হবে তা একবারও ভাবছি না। আসলে বাঙালি হিন্দু রাজনৈতিক স্রোতধারায় খড়কুটোর মতো ভেসে চলেছে. রাজনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে যে দেশের স্বার্থ, ধর্মের স্বার্থ—এ আমরা আর কবে বুঝবো।

দেবগ্রামের মেলায় আক্রমণ চালালো সংখ্যালঘু দুষ্কৃতিরা

অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিল নদিয়া জেলার দেবগ্রাম বাজার সংলগ্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি লাইনের অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে পত্রিকার স্টলে আক্রমণ চালায় তারা। ভাঙচুর করার সঙ্গে সঙ্গে তারা স্টলে কর্মরত কর্মীদের মারধোরও করে।

নদীয়ার কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেবগ্রাম বাজার সংলগ্ন একটি মাঠে প্রতিবছর মেলা বসে। সংখ্যালঘু বহু মানুষ ঐ অঞ্চলে বাস করলেও মূলত হিন্দুদের উদ্যোগেই মেলাটি হয়। এবারই প্রথম দেবগ্রামের কিছু উৎসাহী যুবক 'সাদামাটা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে মেলা উপলক্ষে। পত্রিকার সম্পাদক অনির্বাণ ঘোষ তাঁর সম্পাদকীয় লেখার এক জায়গায় লেখেন— 'আমরা বিশ্বাস করি যে, বছরের দুটো দিনে সাদা পাঞ্জাবী পাজামা পড়লেই সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না। তারজন্য লাগে সাংস্কৃতিক মনোভাব। আমরা এও মনে করি যে, কিছু লিখতে গেলে তারজন্য পাঞ্জাবী পড়ে একটা সাইডব্যাগ ঘাড়ে ঝোলাতে হয় না বা বড় বড় দাড়ি-গোঁফও রাখতে হয় না।' এই লেখার মধ্যে সংখ্যালঘুরা এমন ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন যা নাকি তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে। ক্ষিপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে 'সাদামাটা'-র স্টল আক্রমণ করে। স্টলটিতে ভাঙচুর চালায় ও বই-পত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিয়ে স্টলটিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। পত্রিকাটির সদস্য সুব্রত ঘোষ জানায় যে স্টলে উপস্থিত তাদের কর্মীদের মারধোর করে আক্রমণকারীরা। কালিগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ থেকে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

তাজমহল আদতে শিব মন্দির, চাই হিন্দুদের উপাসনার অধিকার

আদালতে দাবী আরএসএসপন্থী আইনজীবিদের

এতদিন দাবীটা ছিল মৌখিক। আরএসএস সহ গেরুয়া শিবিরের অন্যান্য গোষ্ঠীর নেতা নেত্রীরা মাঝে মাঝে এ দাবী ইতিউতি করে আসছিলেন। কিন্তু এবার আর শুধু মুখের কথা নয়, একেবারে আদালতের শরণাপন্ন! তাজমহল নাকি আদপে শিবমন্দির! অবিলম্বে তার আইন স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এই দাবীতে আরএসএসপন্থী ৬ আইনজীবি আগ্রা সিভিল কোর্টে মামলা ঠুকে দিলেন।

বর্তমানে তাজমহলের দেখভালের দায়িত্ব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার হাতে। হরিশঙ্কর জৈন ও আরও ৫ আইনজীবির দাবী তাজমহলের আসল মালিক ঈশ্বর অগ্রেশ্বর মহাদেব। এই মোকদ্দমার দাবী তাজমহলের সব সমাধি উড়িয়ে সেখানে বন্ধ হোক মুসলিমদের উপাসনার অধিকার, বদলে সেখানে চলুক হিন্দুদের শিবপুজো।

এখনও অযোধ্যার রামজন্মভূমি সংক্রান্ত বিতর্কিত মামলা ঝুলে রয়েছে। এর মধ্যে আরও একটি ধর্ম সংক্রান্ত বিতর্কিত দাবীপূর্ণ মোকদ্দমায় দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের আশঙ্কা করছেন অনেকে।

এই মোকদ্দমায় তাজমহলের মূল ইমারতটিও (যেটিকে একটি মসজিদ হিসাবে বর্তমানে গণ্য করা হয়) তার সামনের অঞ্চল। পশ্চিমদিকে বাগান সহ মূল ইমারতের রেপ্লিকা সহ সমগ্র ৭৭ বিঘার জমির মালিকানা দাবী করা হয়েছে।

আইনজীবিদের দাবী এই সম্পত্তির মালিকানা দেবতার। এখানে নাকি বহু যুগ আগে ঈশ্বর আগ্রেশ্বর মহাদেব নগ্নাথেশ্বর বাস করতেন। এই ল'স্যুটটিতে বলা হয়েছে "এটি কোনও কবরস্থান নয়, কোনওদিন ছিলও না। এখানে কোনও প্রকৃত কবরই নেই। এই স্থানে হিন্দুদের পুজো ছাড়া বাকি সব কিছুই বেআইনি ও অসাংবিধানিক। হিন্দু আইন অনুযায়ী এই স্থানের মালিক পুজ্য দেবতা। এমন কী রাজারও অধিকার নেই ঈশ্বরের সম্পত্তি হস্তান্তর করার।"

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে মহিলাকে ধর্ষণ তৃণমূল নেতার

এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বাসন্তী থানার উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছড়ানিখালি গ্রামে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মোজাম শেখ পলাতক। বিজেপি করার অপরাধেই ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

মহিলার স্বামী পেশায় দিনমজুর। কর্মসূত্রে বেশিরভাগ সময়ই কলকাতায় থাকেন তিনি। সোমবার রাতে শ্বশুরবাড়িতে একাই শুয়েছিলেন তিনি। অন্য ঘরে দুই সন্তানকে নিয়ে ছিলেন তাঁর শাশুড়ি। অভিযোগ ছাদ টপকে ঘরে ঢুকে মহিলাকে ধর্ষণ করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা মোজাম শেখ। মহিলার চিৎকারে পরিবারের সকলে ছুটে এলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত।

বিজেপি করার জন্যই ওই মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের। এমনকী অভিযুক্ত মোজাম শেখ তৃণমূল নেতা বলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ।

অভিযুক্ত মোজাম শেখকে দলীয় কর্মী বলে মানতে নারাজ তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও দোষীর কড়া শাস্তির দাবি করেছে দল। ঘটনার পর নির্যাতিতাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। আপাতত বাপের বাড়িতেই রয়েছেন নির্যাতিতা।

মুসলিম তোষণে কমিউনিস্টরা মাত্রা ছাড়াল

মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় গোমাংস বিক্রি এবং খাওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। তার প্রতিবাদে মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) কলকাতার মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে পছন্দমতো বিভিন্ন ধরণের মাংস খাওয়ার একটি উৎসবের আয়োজন করেন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও ফৈয়াজ আহমেদ খান। কিন্তু মুসলিম ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ এই অনুষ্ঠানের অনুমতি বাতিল করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কান্তিবাবু বলেন, "মানুষের খাদ্যাভ্যাসে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা যায় না। বহু গরিব মানুষের খাবার গোমাংস হল প্রোটিনের একমাত্র উৎস। এই মাংস বিক্রি ও খাওয়া জোর করে বন্ধ করলে বহু মানুষও কর্মহীন হবেন। এর বিরুদ্ধে প্রতীকি প্রতিবাদের জন্য এই উৎসব করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম।"

কমিউনিস্ট নেতা ব্রাহ্মণসন্তান কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য শুনে তার অনুগামীরা পুলকিত। কিন্তু তার অনুগামীদের মধ্যে তপশিলী জাতি-উপজাতিভুক্ত বহু গরিব মানুষ শুয়োরের মাংস নিয়মিত খেতে অভ্যস্ত। গরিব মানুষের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলার সময় এদের কথা কান্তিবাবুর একবারও মনে পড়ল না। মনে ঠিকই পড়েছে। কিন্তু চিরকালের মোল্লা-তোষণকারী এই কমিউনিস্ট নেতাদের সাহস নেই গরিব হিন্দুর কথা ভেবে প্রোটিনযুক্ত শুয়োরের মাংসকেও খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। সাধারণ মানুষ আজ বুঝে গিয়েছে এদের ভণ্ডামী ঃ মুখে ধর্মনিরপেক্ষতা, কাজের বেলায় মোল্লা-তোষণ। তাইতো বাংলায় কমিউনিস্টদের আজ এই হাল।

‘‘স্বাধীন ভারতের ভিত নির্মাণে গলদ’’

তপন কুমার ঘোষ

প্রথম পর্ব

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আজকের প্রজন্মের যুবসমাজ অন্তত কিছুটা জানে। কারণ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে এবং সরকারী ও বেসরকারী স্তরে এ বিষয়ে কিছু উদ্যোগ আছে। যদিও দীর্ঘ ষাট বছরের কংগ্রেসী জমানায় গান্ধী ও নেহেরু পরিবারের অবদান সত্যের থেকে অনেকটা বেশি করে দেখানো হয়েছে; আর বিপ্লবীদের ও নেতাজীর অবদানকে খুবই কম করে দেখানো হয়েছে। তবুও পাঠ্যক্রমের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে অনেক বই থাকার ফলে মানুষ কিছুটা হলেও জানে। কিন্তু ঠিক স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের ইতিহাস অনেকেই জানে না। এই পর্বের ইতিহাস জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময়েই স্বাধীন-আধুনিক ভারতের ভিত্তি নির্মাণ হয়েছিল। সেই ভিত নির্মাণেই যে বড্ড বেশি গলদ্ হয়ে গিয়েছিল তা আজকের এই অনুন্নত (মিষ্টি করে বললে উন্নয়নশীল) ভারত, জাতীয় সংহতি বিপন্ন ভারত, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে জর্জরিত ভারত দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এটাও আমি মনে করি যে ভিত্-এর ওই গলদ্ সংশোধন করে আবার একটা বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল ভারত নির্মাণের প্রচেষ্টা এই প্রাচীন হিন্দুজাতি এখনও করে চলেছে। এই প্রচেষ্টায় সাফল্য পাওয়া বা না-পাওয়ার দ্বারাই প্রমাণিত হবে যে এই প্রাচীন হিন্দু জাতি এখনও তার যৌবনকে ধরে রাখতে পেরেছে, না জরাগ্রস্ত বার্ধক্যে প্রবেশ করেছে! কারণ পৃথিবীতে চিরকালই সকল মানুষ ও সকল জাতির সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল, আছে ও থাকবে। একমাত্র যৌবনই পারে যে কোন চ্যালেঞ্জের সফলভাবে মোকাবিলা করতে। হিন্দু জাতি বৃদ্ধ হয়ে গেছে—একথা বলার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু সে আশঙ্কা আমার আছে। আগামী পঞ্চাশ বছরের ঘটনাক্রম প্রমাণ করবে যে আমার আশঙ্কা ঠিক না ভুল।

ফিরে আসি মূল বিষয়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের কথা বলতে হলে স্বাধীনতা পূর্বের একটুখানি কথা না বললেই নয়। সে কথা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা নয়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভেজাল, আপস, ক্ষমতালিপ্সা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ডীল (Deal)-এর কথা।

আমাদের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে আমরা তো গৌরবোজ্জ্বল বলবই। আমাদের কাছে তা আমাদের পূর্বপুরুষের গৌরবকথা। কিন্তু পৃথিবীর আরও অনেক পরাধীন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে খুব বেশি উজ্জ্বল বলা যায় না। তা খুব বেশি অনুজ্জ্বলও নয়। তবে সাধারণ, অন্ততঃ আয়ারল্যান্ড-এর সঙ্গে তুলনা করলে।

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভেজাল মেশানো প্রকটভাবে শুরু হল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর দ্বারা ১৯১৯ সালে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, পরিণাম বুঝে বা না বুঝে অনেকেই ওই ভেজাল দেওয়ায় অংশগ্রহণ করলেন—মুসলিম তুষ্টিকরণের ভেজাল। অনেকেই জেনে স্তব্ধ হয়ে যাবেন যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৩-২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র হিসাবে মুসলিমদের জন্য চাকরিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করেছিলেন। আরও বহু নেতাই নিজেদেরকে উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ দেখানোর লোভে দু'চারটে মুসলমানকে কাছে টানার জন্য ঐ একই মুসলিম তোয়াজের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। এটাকেই আমি বলি স্বাধীনতা আন্দোলনের ভেজাল। কিন্তু এরা কেউই বদ্‌মতলবে এই কাজ করেননি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীর ভারতে আসার পিছনে সঠিক কারণ কী—তা রহস্যাবৃত। গান্ধী বিরোধীরা খুব জোরালো কণ্ঠে বলেন যে ব্রিটিশভক্ত গান্ধী ব্রিটিশের নির্দেশেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধ্বজভঙ্গ করতে ভারতে এসেছিলেন। আমি একথায় জোরালো সায় দিতে পারব না। কিন্তু গান্ধী বিরোধীদের এই মতকে উল্লেখ করাটাও আমার কর্তব্য। এছাড়া আমার একটা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আছে। ১৯০৫ সালে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যে আমাদের কংগ্রেস তখনও হাঁটি-হাঁটি পা পা। তারা তখনও ভারতের স্বাধীনতাটুকুর দাবীও করেনি (১৯৩০ সালে প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব নেয়)। লাল-বাল-পাল এর তখনও উত্থান হয়নি, আর আমাদের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ সবে অরবিন্দ পুঁতেছেন, চারাগাছ বেরোয়নি। ক্ষুদিরাম এর বোমা তখনও ফাটেনি। সেইসময় ব্রিটিশের ১৯০৫ সালে ঘোষণা করা ‘‘বঙ্গভঙ্গ’’ আমরা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলাম। অথচ ১৯৪৭ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ব্রিটেন, আর অন্যদিকে স্বাধীনতার দাবীতে উত্তাল ভারত, বিশাল কংগ্রেস, নেতাজীর আহ্বানে বিদ্রোহী ব্রিটিশ ফৌজের ভারতীয় সৈন্য। তখন আমরা ব্রিটিশ চক্রান্তের দেশভাগ আটকাতে পারলাম না কেন? ১৯০৫-এ শক্তিশালী ব্রিটিশের চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করে দিতে পেরেছিলাম। ১৯৪৭-এর দুর্বল ব্রিটিশ এর চক্রান্ত আটকাতে পারলাম না কেন? মাঝের সময়টাতে, বিশেষ করে ১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত গান্ধীই তো ভারতের সবথেকে বড় নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন! তাই সেই সময়টুকুতে দেশের ভাল-মন্দের দায় তো তাঁর উপরেই অনেকটা পড়বে। সুতরাং গান্ধীবিরোধীদের ওই অভিযোগ, অর্থাৎ ভারতকে দুর্বল করতে ও ভারতের জাতীয় আন্দালনকে ধ্বজভঙ্গ করতে ব্রিটিশরা গান্ধীকে ভারতে নিয়ে এসেছিল—এ অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু আজকের প্রসঙ্গের আলোচনায় আমি গান্ধীর প্রতি এই সন্দেহকে পাশে সরিয়ে রেখে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান মুসলিম তোষণকে শুধুমাত্র ভেজাল হিসাবে গণ্য করছি।

বিধির বিধানে হিটলারের ভুল, আমেরিকার অংশগ্রহণ ও চার্চিল-এর নেতৃত্বে ব্রিটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জিতল বটে, কিন্তু সে হয়ে গেল বিধ্বস্ত দুর্বল। পৃথিবীজোড়া বিশাল সাম্রাজ্য ধরে রাখার ক্ষমতা আর তার থাকল না। তাই ১৯৪৫ সালে যুদ্ধশেষেই সে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিল। কিন্তু ভারত তো ছিল তার বিশাল সাম্রাজ্যের মাথার মণি! ভারতকে শোষণ করে ব্রিটিশ যে কী পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়েছিল, ভারতের অতুলনীয় বীর সেনাবাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বিশ্বযুদ্ধেই ব্রিটিশকে যে কী পরিমাণ সাহায্য করেছিল সে কাহিনী লিখতে গেলে দুটো বই হয়ে যাবে। সেই সোনার খনি ভারতকে ছেড়ে যেতে হবে—তা কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? তাই, যেতে যেতেও ভবিষ্যতে ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু খেলা যে খেলে যাবে—তা কি খুব আশ্চর্য? তাদের সেই খেলার সবথেকে নির্ভরযোগ্য সাথী হিসেবে পেয়েছিল নেহেরুকে। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত, নিজ ধর্মে লজ্জিত, সাদা চামড়া মুগ্ধ, সুরাসেবী, চেন্-স্মোকার, দুর্বল-চরিত্র, নিজ পত্নীর প্রতি অবিশ্বস্ত, বাক্যবাগীশ---এতগুণে গুণী জওহরলাল নেহেরু! তাই তাঁকেই ইংরেজরা মনোনীত করেছিল তাদের স্বার্থবাহক হিসাবে। ব্রিটিশ বেনিয়া জাতি। তারা লেন-দেন জানে। বিনামূল্যে মাল নেয় না। তাই, তাদের স্বার্থবাহক নেহেরুকে মূল্য হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর পদ পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আর ঐ প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য ভারতের স্বার্থের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন নেহেরু। কিন্তু গান্ধী, নেহেরু ছাড়াও কংগ্রেসের আরও অনেক দিক্‌পাল নেতাও তো ছিলেন! তাঁরা ঐ বিশ্বাসঘাতকতার অংশীদার হলেন কেন? পাপের ভাগীদার হলেন কেন? ইতিহাস এর উত্তর দিচ্ছে—বার্ধক্য, আর নেতৃত্বের ক্লান্তি। লড়াই করতে করতে, জেল খাটতে খাটতে নেতারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বার্ধক্য ও ক্লান্তি তো আসবেই! এটা তো প্রাকৃতিক। এতে তো কারো দোষ নেই। তাই তাঁদের উচিত ছিল অবসর গ্রহণ করে পরবর্তী প্রজন্ম বা তরুণ নেতৃত্বের হাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালন ভার তুলে দেওয়া। কিন্তু, মানুষ তো! লোভ, মোহ, ইত্যাদির উর্দ্ধে তো নয়। তাই সেদিনের সেই ক্লান্ত, বৃদ্ধ নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ভার তরুণের হাতে তুলে না দিয়ে আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে আপোষ করে ক্ষমতার গদিতে বসলেন। সে আপোষ খুব বড় ধরণের আপোষ ছিল—দেশমাতৃকার বিভাজন। তাই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই হল তিনটি নীতিবাচক দিক (Factor) ঃ ভেজাল, বার্ধক্য ও বিশ্বাসঘাতকতা।

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশরা উড়িয়ে নিয়ে এল মাউন্টব্যাটেনকে। মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন কেল্লা ফতে করে দিলেন। ভারতকে ভেঙে দিলেন, দুর্বল করে দিলেন, দুদিকে শত্রু রাষ্ট্র তৈরি করে দিলেন, সর্বোপরি এই স্বর্ণগর্ভা, বিপুল সম্ভাবনাময় ভারতের পরিচালনভার তুলে দিলেন ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষাকারী জওহরলাল-এর হাতে। একেই আমি বলি—‘‘ডীল (Deal)’’। পরে আরও অনেক ‘‘ডীল’’ এর কথা আসবে। এই ডীলের জন্যই ভারতের স্বাধীনতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বাধীনতা না বলে ‘ক্ষমতার হস্তান্তর’ বলা হল। অর্থাৎ, We did not win our freedom. But British transferred power to us. জিতলে কোন শর্ত থাকে না। হাতবদল হলে শর্ত থাকে। কিন্তু আজও আমরা জানিনা সেদিনের সেই ক্ষমতা হস্তান্তরের গোপন শর্ত কী কী ছিল? আমাদের যিনি যখন প্রধানমন্ত্রী পদে বসেন, একমাত্র তিনিই তখন সেই শর্তগুলি জানতে পারেন এবং সেই শর্তগুলি পালনে বাধ্য থাকেন। অতএব, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই চারটি ভুল বা পাপ নিয়েই স্বাধীন ভারত—নতুন ভারতের যাত্রা শুরু হল ঃ ভেজাল, বার্ধক্যের ক্লান্তি, বিশ্বাসঘাতকতা ও ‘‘ডীল’’।

যাত্রা শুরু হল স্বাধীন ভারতের। কিসের স্বাধীন? কেমন স্বাধীন? পরাধীন ভারতে হত ভাইসরয়, চলতি কথায় বড়লাট। স্বাধীন ভারতে হল গভর্ণর জেনারেল। কে? সেই লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তাহলে এ কেমন স্বাধীনতা? ভারতভাগের সময় ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল—প্রথমে কিছুদিন, যতদিন দুটি নবগঠিত রাষ্ট্র হাঁটি হাঁটি পা পা, ততদিন পর্যন্ত দুই দেশেরই গভর্ণর জেনারেল (এখন যাকে রাষ্ট্রপতি বলা হয়) মাউন্টব্যাটেন থাকুন। জিন্না ও পাকিস্তান এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু ভারত মেনে নিল সেই প্রস্তাব। স্বাধীন দেশের পক্ষে এটি কি লজ্জার নয়? তাই মনে হয়, ব্যক্তি হিসাবে নেহেরুর থেকে জিন্না অনেক বেশি স্বাভিমানী ও মেরুদণ্ডযুক্ত ছিলেন। সুতরাং গোপন শর্ত ও মাথার উপরে মাউন্টব্যাটেন—এই নিয়ে যাত্রা শুরু হল স্বাধীন ভারতের।

ক্রমশ...

হাওড়ার বাগনানে কটুক্তি করতে বাধা দেওয়ায় মারধোর

গত ২০ ফেব্রুয়ারী হাওড়া জেলার বাগনান থানার বাইনান গ্রামে ষষ্ঠিতলাতে সন্ধ্যা ৭টার সময় সেখ বাপ্পা নামে একটি ছেলে একটি মেয়েকে কটুক্তি করে। দেবাশীষ পাঁজা নামে ষষ্ঠিতলার একজন যুবক প্রতিবাদ করলে তাকে দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরেরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারী সেখ বাপ্পা, সেখ ইলা, সৈয়দ আকিব এর নেতৃত্বে মীরপাড়া, জোমাদার পাড়া, মিদ্যেপাড়ার ছেলেদের নিয়ে সন্ধ্যাবেলা, দেবাশীষ পাঁজা, সৌম্য রায়, ছোটু রায়কে রাস্তায় পেয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে। লোকজন খবর পেয়ে আসলে তারাও মারধোর খায়। ভয়ে হিন্দুরা ঘরে ঢুকে যায়। তখন কয়েকটি মোটরসাইকেলে করে হিন্দু পাড়ার মধ্যে দিয়ে সেখ বাপ্পা, সৈয়দ আকিবরা তাদের দলবল নিয়ে যাতায়াত করে এবং বলে ঘর থেকে বেরোলেই কেটে ফেলবো। ঘরদোর ভাঙচুর করার ও প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তখন হিন্দুরা থানায় ফোন করলে ডিউটি অফিসার বলেন, আমরা কি থানা ছেড়ে তোমাদের ঐখানে চলে যাব। তখন বাগনানের সংহতির ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং যারা মার খেয়েছে তাদেরকে নিয়ে হাসপাতালে যায়। ঐখান থেকে থানাতে যায় তখন রাত্রি ১২টা। থানা কোনোরকম লিখিত অভিযোগ না নিয়ে কেবল মাত্র সাধারণ ডাইরি নেয়। এর আগে বাইনান হাইস্কুলে একটি মুসলিম হোস্টেল চালু করতে চাইলে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বাধা দেয়। হিন্দু সংহতির সাহায্য নেয়। আপাতত মুসলিম হোস্টেলটির কাজ বন্ধ আছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী বাইনান থেকে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রায় ৫০ জন কর্মী সমর্থক ধর্মতলায় মিটিংয়ে আসে। এর ফলে স্থানীয় মুসলমানদের ক্ষোভ জন্মে।

লেখিকা আক্রান্ত ইসলামের হাতে

জয়নাব প্রিয়া দালাল নামে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী লেখিকার গলায় ছুরি ধরে ইঁট দিয়ে মুখ থেঁতলে দেওয়া হল। কারণ তিনি তাঁর লেখায় বিতর্কিত মুসলিম লেখক সলমন রুশদির প্রশংসা করেছিলেন। এই ঘটনা আজকাল আর মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মুক্তমনা লেখক অভিজিৎ রায়কে খুন হতে হয়েছে বাংলাদেশি উগ্র ইসলামিকদের হাতে। গত ৩০শে মার্চ ইসলামিক ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে নিজ ব্লগে লেখার জন্য ওয়াশিকুর নামক এক যুবককে খুন হতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন মহলে আজ একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এগুলো সন্ত্রাসবাদীদের কাজ না সাধারণ মুসলমানের কাজ? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রবীণ ব্যক্তির কথায় সাধারণ মুসলমানের মনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে আইএস। সন্ত্রাসবাদ হল প্রতিবিম্ব, মূল সমস্যাটা হল ইসলামের অসহিষ্ণুতার শিক্ষা। আর এই শিক্ষার বীজ লুকিয়ে প্রতিটি মুসলমানের মনে, যা কোনদিন মরে না।

পশ্চিমবঙ্গের এক বুদ্ধিজীবী লেখক (ইনিও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক) এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করে এই প্রতিবেদককে জানান, মূল সমস্যাটা সন্ত্রাসবাদ নয়। সাধারণ মুসলমানের আগ্রাসন। এ তাদের ধর্মীয় শিক্ষার ফল। আমরা যেন ভুলে না যাই নোয়াখালি থেকে দেগঙ্গা-নলিয়াখালি, কোথাও কিন্তু তালিবান বা আইসিসের হাত ছিল না। এটা আজ সকলের বোঝার সময় এসেছে।

মৌলবীদের আপত্তিতে মহিলাদের ফুটবল ম্যাচ বাতিল

মৌলবীদের আপত্তিতে খোদ পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের একটি আমন্ত্রণী ফুটবল ম্যাচ বাতিল করতে বাধ্য হল প্রশাসন। মৌলবীদের আপত্তির কারণ হল মহিলাদের আঁটো এবং ছোট পোশাক। খেলা বন্ধের নিদান যারা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ, সেই ধর্মগুরুদের বক্তব্য আঁটোসাঁটো ও ছোট পোশাক পরে মহিলাদের খেলা এবং সেই খেলা দেখা, দুই-ই শরিয়ত আইন বিরোধী। অতএব খেলা বন্ধের হুকুম দেন তারা । প্রশাসনও তাদের কাছে মাথা নত করে খেলা বন্ধ রাখতে বলে আয়োজকদের। প্রশাসনের কর্তাদের ভয়, যদি আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দেয়, তাই তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। গত ১৪ই মার্চ ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার চাঁচল থানার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুরের চণ্ডীপুরে।

স্থানীয় প্রোগ্রেসিভ ইয়ুথ ক্লাব তাদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চণ্ডীপুরে একটি মহিলাদের ফুটবল ম্যাচ আয়োজন করে। ক্লাবের সভাপতি জানায়, এলাকার মেয়েদের খেলাধূলায় আগ্রহ বাড়বে ভেবেই মহিলা তারকা খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে জাতীয় ফুটবল দলের কয়েকজন মহিলা খেলোয়াড়ের খেলার কথাও ছিল। কিন্তু প্রশাসন এভাবে মৌলবীদের শরিয়তি ফতোয়ার কাছে মাথা নত করবে, একথা অঞ্চলের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মানতেই পারছে না।

স্বভাবতই এই ঘটনায় অনেকের মনে পড়ে যাচ্ছে আরব দুনিয়ার হরেক মৌলবাদী ফতোয়ার কথা। খেলাধূলা তো দূর, একসময় প্রকাশ্য রাস্তায় আফগান মেয়েদের চাবুক পর্যন্ত মারতো তালিবান পুলিশ। ইরানে ধর্ষিতা মহিলা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার অপরাধে সাজা পায়। কিন্তু সে তো আরব দুনিয়ায়। ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এমন এক ফতোয়া প্রশাসন কীভাবে মেনে নিল তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠছে।

চণ্ডীপুর মসজিদের ইমাম মহম্মদ মকসুদ আলম বলেন, গ্রামবাসী তার কাছে জানতে চেয়েছিল খেলা দেখা যাবে কিনা। মেয়েদের আঁটোসাঁটো পোশাক পড়ে খেলা বা তা দেখা শরিয়ত বিরোধী বলে তিনি গ্রামবাসীদের জানান। এ নিয়ে মৌলবীরা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিডিও-র কাছে খেলা বন্ধ রাখার দরবারও করেন। প্রশাসন নিজের পিঠ বাঁচাতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ও আইন শৃঙ্খলার অবনতির দোহাই দিয়ে খেলা বন্ধ রাখার আদেশ দেন।

আইসিস থেকে আই এস জি বি

ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক অ্যান্ড সিরিয়া (আই এস আই এস) এবার সিরিয়া, ইরাক থেকে আমাদের রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। ইরাক ও সিরিয়াকে নিয়ে একটি নতুন ইসলামিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য আইসিস যুদ্ধ করছে। এখন তাদের নজর পড়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের দিকে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের একাংশ ও মায়ানমারের একাংশকে নিয়ে তারা একটি ইসলামিক স্টেট গঠন করতে চায়। আগে এটাকে বলা হত গ্রেটার বাংলাদেশ। আইসিস-এর থেকে প্রেরণা পেয়ে তারা হয়তো এখানে ''ইসলামিক স্টেট অফ গ্রেটার বাংলা (আই এস জি বি) তৈরি করবে।''

কারণ 'জামাত-উল-মুজাহিদিন অফ বাংলাদেশ' (জেএমবি) ২০২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারতের কিছু অংশ ও মায়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে সম্পূর্ণ শরিয়া শাসিত একটি নতুন ইসলামিক রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জেএমবি জেহাদী এরশাদ হোসেন ওরফে মামুনকে পুলিশি জেরায় এই তথ্য উঠে এসেছে। সে আরও জানিয়েছে যে এরজন্য পাকিস্তানে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত প্রায় এক হাজার জেহাদীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। পুলিশি জেরায় এরশাদ আরও জানিয়েছে যে পরিচয় গোপন রাখার জন্য জেহাদিদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাতে রাস্তার হকার, দিনমজুর হিসেবে কাজ করা বা ছোট ছোট অস্থায়ী দোকান তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জেএমবি বাংলাদেশের বান্দারবন, রাঙামাটি, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম এবং ভারত-বাংলাদেশ ও মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কিছু এলাকাকে তাদের যুদ্ধের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সে আরও জানিয়েছে, গত অক্টোবর মাসে তিনটি জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিন অফ বাংলাদেশ, হরকত-উল- জিহাদ ইসলামিক এবং আনসারউল্লাহ বাংলা টিম এব্যাপারে আইসিস-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে।

জমি দখল করে দোকান তৈরির প্রতিবাদ করলো সাধারণ মানুষ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাট থানার অন্তর্গত জীবন বটতলায় প্রতি বছর জলসত্র তৈরি করে জনসাধারণকে জল দেওয়া হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে পথক্লান্ত মানুষের কথা ভেবেই এলাকার সাধারণ মানুষ এই জলসত্রের আয়োজন করেন। ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেই এখানে জলপান করেন। এই শুভ প্রচেষ্টার উপর আঘাত হানলো কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তারা জলসত্র-র জায়গার উপর একটি দোকানঘর গড়ে তোলে। বহুবার দোকানঘরটি সরাতে বললেও তারা সেটি না সরানোয় এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানটি ভাঙচুর করে। দোকান ভাঙা নিয়ে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ আসে এবং মিটমাট করে নিতে বলে। সমস্ত পার্টির লোকদের নিয়ে এলাকায় একটি মিটিং করা হয়। মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে দোকানটি তারা তুলে নেবে। কিন্তু তারপরেও তারা দোকানটি সরায়নি। এদিকে জলসত্রের সময় এসে পড়েছে। এরকম অবস্থায় গত ১৫ই মার্চ এলাকার সাধারণ মানুষ দোকানটি বটতলা থেকে সমূলে উৎপাটিত করে দেয়। ঠিক হয়েছে যে ১৭ মার্চ (বুধবার) থেকে জলসত্র দেওয়া হবে।

মগরাহাটে নাবালিকা অপহরণ ঃ দুষ্কৃতি অধরা

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী দঃ ২৪ পরগণার মগরাহাট মানপু, কালিকাপোতা থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ী সুভাষ মণ্ডলের নাবালিকা কন্যাকে অপহরণ করা হয়। এই ১৪ বছরের মেয়েটি হাঁসুড়ি হাইস্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মগরাহাটের সুঁড়িপুকুর এলাকার উনজান গাজীর ছেলে বাবুসোনা গাজী এই অপহরণের মূল হোতা বলে অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে মগরাহাট থানায় ২৬ ফেব্রুয়ারী এফ.আই.আর করা হয়েছে। পুলিশ ১০৮/৩৬৪/৩৬৬এ/৩৪ আইপিসি ধারায় বাবুসোনার বিরুদ্ধে কেস করলেও গ্রেপ্তার বা অপহৃতার উদ্ধারের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন নির্বিচারে ধ্বংস করল আই এস

মার্চ মাসের শুরুতে টাইগ্রিস নদীর তীরে অ্যাসিরিও শহর নিমরুদে-তে হামলা চালায় আই এস জঙ্গীরা। তারা শহর দখল করার পর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো একটার পর একটা ধ্বংস করতে থাকে। পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সভ্যতাগুলোর যে সব স্থাপত্য শিল্প আজও বিদ্যমান ইতিহাসের স্মারকচিহ্ন রূপে, তা নিষ্ঠুরভাবে হাতুড়ি, কোদাল, গাঁইতি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ইসলামিক স্টেস্ট-এর জঙ্গিরা।

ধ্বংসের পাশাপাশি চলছে ব্যাপক লুটপাট। লুটের মাল বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে অর্থও সংগ্রহ করছে তারা। উল্লেখ্য, এর আগে জঙ্গীদের হাতে বন্দী ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে ছিল তারা। এবার মহামূল্যবান প্রত্নসামগ্রী তারা চোরাপথে বিক্রি করছে। জেরুজালেম থেকে জানানো হয়েছে চোরাপথে এর আগেও প্রত্নসামগ্রী বিক্রি করেছে জঙ্গীরা। এবার সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে চাইছে জঙ্গীরা। ইরাক ও সিরিয়া থেকে লুট হওয়া কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বিকোচ্ছে অনলাইনে। প্রাচীন কিছু মুদ্রা ছাড়াও তালিকায় রয়েছে দুর্লভ কিছু অলঙ্কার ও স্থাপত্য। ওয়েবসাইটে এই চিত্র বারবার দেখা গেছে। সম্প্রতি পশ্চিম সিরিয়ার আপামিয়া শহর থেকে খোয়া যাওয়া এমনই দুটি মুদ্রার দেখা মিলেছে ওয়েবসাইটে। অনুমান, মুদ্রা দুটি প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার নিদর্শন। অনলাইনে মুদ্রা দুটির দামও ধার্য করেছে জঙ্গীরা। একটি দাম ৫৭ ইউরো, অন্যটি ৯০ ইউরো।

বিষয়টি নজরে আসার পর দুনিয়া জুড়ে প্রতিবাদ ধিক্কারের ঝড় উঠেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আই এস পশ্চিমী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিকেও তোয়াক্কা করে না। তারা জানিয়েছে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সভ্যতার নিদর্শন তারা এই অঞ্চলে থাকতে দেবে না। একসময়ে তালিবানীরাও আফগানিস্তানে একই ফতোয়া জারি করেছিল। ভেঙে দিয়েছিল বহমিয়ার ৭০ ফুট উঁচু স্থাপত্যকলার অপরূপ নিদর্শন বুদ্ধমূর্তিটি। আই এস জঙ্গীরাও এই পথেই চলেছে। বিধর্মীদের প্রতি তাদের ঘৃণা আজ সারা বিশ্বে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আমেরিকা সহ অনেকেই তাই আই এস-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছে। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ. জানিয়েছে অস্ত্র ও অর্থে আই এস আজ রীতিমতো শক্তিশালী। চাইলেই এদের রাতারাতি শেষ করা সম্ভব নয়।

ভারতের পরাজয়ে উচ্ছ্বসিত বাংলাদেশ

সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর স্থানে স্থানে হামলা

এই উল্লাস দেখলে বড় থেকে বড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাও হয়ত একবার ভেবে বসতেন, বোধহয় আজকের ম্যাচটি ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া নয়, বরং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ছিল এই ম্যাচ। আজকে ভারতের শেষ উইকেটখানি পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভারতের পরাজয়ের জন্য বাংলাদেশের বিজয় মিছিল।

গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে শহরের চৌরাস্তা থেকে শুরু করে শপিং মল ও রাস্তাঘাট সবেতেই যেন এক উৎসবের পরিবেশ, ভারত হেরেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি-তে বিজয় সমাবেশ ও মিছিল বার হয়, ঢাকার পথঘাট ছেয়ে যায় আনন্দে মাতোয়ারা বাংলাদেশিদের উচ্ছ্বাসে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সংগঠন এই সকল সমাবেশের আয়োজন করে। কি নাস্তিক কি আস্তিক, কি চরমপন্থী, কি মুক্তমনা—আজ ভারতের পরাজয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। এই উচ্ছ্বাস বাংলাদেশের জয়ের জন্য কম, ভারতের পরাজয় ও অপমানের জন্য বেশি। অপরপক্ষে এই উপলক্ষে বাংলাদেশের মুসলিমপন্থীরা আরো একখানা সুযোগ পেয়েছে তাদের হিন্দুবিদ্বেষের প্রতিফলন ঘটনোর জন্য। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ও শহরগুলির বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণের খবর আসছে। প্রসঙ্গত হিন্দুদের ভারতের দালাল বলে আখ্যা দিয়ে তাদের প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার জাঁতাকলে পেষা হয়। ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে আনোয়ারা উপজেলার কেয়াগর গ্রাম অনুকূল ঠাকুরের মহোৎসবে ভাঙচুর চালানো হয়। ভারত হেরে যাওয়ায় আনন্দে মিছিল বের করে কতিপয় যুবক। মিছিলটি মহোৎসব স্থান অতিক্রম করা কালে মহোৎসবের মাইকের আওয়াজ কমিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে হামলা করে অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেয় তারা। এই সময় স্থানীয়দের সহায়তা এবং এসএমএস-বাংলাদেশ-এর উপজেলা আহ্বায়ক বাবু অজয়ের দ্রুত তৎপরতায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ। তেমন হতাহত না হলেও উৎসব স্থান পুরোই নষ্ট হয়ে গেছে বলে কেন্দ্রকে অবহিত করেন বাবু অজয় চৌধুরী। এসএমএস-বাংলাদেশ পক্ষ থেকে আর্থিক ক্ষতি নির্ধারণে মহোৎসব কমিটির সাথে যোগাযোগ করছে কেন্দ্র।

বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে প্রায়সয় হিন্দু জনতাকে মুসলিম আগ্রাসনের শিকার হতে হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে বাংলাদেশের মুসলিম জনতা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানকে সমর্থন করে যদিও পাকিস্তান বাংলাদেশের সাথে কি করছে তা আজ সর্বজনবিদিত, আর যে ভারত এক সাগর রক্ত বইয়ে তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তারা আজ পরম শত্রু হিসাবে গণ্য বাংলাদেশে। আর ভারতবিদ্বেষের বলির পাঁঠা হলো বাংলাদেশী হিন্দু।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

তালতলীর ১৪ হিন্দু পরিবার ভিটেমাটি ছাড়া

বড় বড় নারকেল, সুপারি, বরইসহ বিভিন্ন ধরণের ফল আর ফুলগাছে ঘেরা ভিটেগুলো। ঘর নেই, মানুষও নেই। শূন্য ময়দানে সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারগুলোর শেষ চিহ্নগুলো জানান দিচ্ছে কিছুদিন আগেও সেখানে মানবের বসবাস ছিল।

বরগুনার তালতলী উপজেলার পঞ্চকোড়ালিয়া ইউনিয়নের চন্দনতলা (মগপাড়া হিসেবে পরিচিত) গ্রামে গিয়ে এমন চিত্র দেখা গেছে। স্থানীয় এক যুবলীগ নেতার ইশারায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে ওই গ্রামের ১৪টি হিন্দু পরিবার তাদের বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিন ওই গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, শূন্য ভিটেয় আছে পুকুর, পাকা টয়লেট। পড়ে আছে ক'দিন আগে রান্নার কাজে ব্যবহৃত চুলা। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে মাটির সানকি সহ পুরানো অসংখ্য চিহ্ন। শুধু মানুষ নেই। দিনের পর দিন অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে বিচার না পেয়ে হিন্দু পরিবারগুলো বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন বলে ভুক্তভোগী ও স্থানীয়দের অভিযোগ।

ভুক্তভোগী যাদব সরকার (৪৩) দ্য রিপোর্টকে বলে, 'স্থানীয় মুনসুর আকনের ছেলে আ. রশিদ আকন (৪২) প্রায়ই তাদের নিকট চাঁদা দাবি করতো। না দিতে পারলে ভয়ভীতি দেখাতো। তার স্কুলপড়ুয়া মেয়েকেও সে নানাভাবে উত্যক্ত করতো।'

তিনি বলেন, 'রশিদের রক্তচক্ষুর ভয় উপেক্ষা করে স্থানীয়ভাবে বিচার চেয়েও না পেয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করেন। মামলায় রশিদ জেল খাটে। জেল থেকে ফিরে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সমন্বয়ে বিচারের আশ্বাসে মামলা তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু বিচার পাওয়া তো দুরের কথা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রশিদ হিন্দু পরিবারগুলোর ওপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার শুরু করে।'

তিনি অভিযোগ করেন, 'নির্যাতনের মুখে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে প্রথম তিনটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে বরগুনা শহরে আশ্রয় নেয়। একই কারণে ২০১৪ সালের শুরুর দিকে আরও দুটি পরিবার শহরে আশ্রয় নেয়। সর্বশেষ ১৩ মার্চ মগপাড়া গ্রাম থেকে নয়টি পরিবার একযোগে ভিটেমাটি ত্যাগ করেন।'

২৩ মার্চ বিষয়টি জানাজানি হয়। এ নিয়ে জেলার নাগরিক সমাজে ব্যাপক আলোচনার ঝড় ওঠে। অবশেষে বিচারের আশ্বাস পেয়ে ওই দিন যাদব সরকার বাদী হয়ে আ. রশিদকে প্রধান আসামী করে অজ্ঞাতপরিচয় আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার আইনের ৪ ও ৫ ধারায় তালতলী থানায় মামলা দায়ের করেন। ওই দিনই তালতলী থানা পুলিশ ঘটনার মূলহোতা আ. রশিদ আকনকে (৪২) গ্রেফতার করে।

তালতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবুল আখতার বলেন, 'মামলাটি গভীরভাবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।'

পঞ্চকোড়ালিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম কালু পাটোয়ারী বলেন, 'রশিদের বিভিন্ন অন্যায় কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী বেশ কিছুদিন আগে মানববন্ধন করেছিল। তার অত্যাচারে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। তিনিও বেশ কয়েকবার সালিশী বৈঠক করেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।'

'হিন্দু পরিবারগুলোর চলে যাওয়ার বিষয়টি কোনোভাবেই মানতে পারছেন না' বলে জানান তিনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আ. রশিদের পেছনে ওই গ্রামেরই হাকিম আলী সরদারের ছেলে যুবলীগ নেতা জাকির হোসেনের (৪০) হাত হয়েছে। তারই ইশারায় গ্রামে একের পর এক অন্যায় ঘটনা ঘটেছে।

চন্দনতলা গ্রামের তাসলিমা বেগম (৪০) বলেন, 'প্রতিবোশী হিদু পরিবারগুলোর এভাবে চলে যাওয়া কিছুতেই মানতে পারছি না। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'যাবার দিন হঠাৎ করেই কাউকে কিছু না বলে তারা বাড়ি থেকে একত্রে বেরিয়ে পড়েন। পরে হাকিম আলী সরদারের ছেলে আ. সালাম (৫০), যুবলীগ নেতা জাকির হোসেন (৪০) ও ইলিয়াসের নেতৃত্ব হিন্দুদের ঘরগুলো একদল লোক এসে ভেঙে দিয়ে যায়। হিন্দুরা বাধ্য হয়ে তাদের কাছে কম মূল্যে বাড়িগুলো বিক্রি করে দেন।'

পাশের বাড়ির আনোয়ারা বেগম (৬৫) বলেন, 'ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না। তবে রশিদসহ অনেকের অত্যাচারে তারা এলাকা থেকে চলে গেছেন।'

যুবলীগ নেতা জাকির হোসেন অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, 'আ. রশিদের কোনো দোষ নেই। হিন্দুরা ইচ্ছা করেই এলাকা থেকে ঘরগুলো বিক্রি করে চলে গেছে।'

প্রতিবেশী আ. রশিদ মাস্টার দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'সবকিছু প্রকাশ করা যাবে না। তবে পরিবারগুলো বড় ধরণের কষ্ট নিয়ে সব ফেলে চলে গেছে।'

ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে রয়েছে—কার্তিক রায় (৬০), হরেন রায় (৫৫), যাদব সরকার (৪২), মাধব সরকার (৪৫), ধীরেন সরকার (৭৫), সুভাষ সরকার (৪৪), রমেশ সরকার (৩২), রিপন রায় (৪০), নীলা রানী (৫০), রণজিৎ সরদার (৬০), শ্যামল (৪১), সুমন্ত (৪২), বাবুল (৩৫) ও জিতেন রায়ের (৬৫) পরিবার।

চলে আসা পরিবারগুলোর মধ্যে ইতি রানী (১৪) বলেন, 'তিনি বগিরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তার লেখাপড়া এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।'

বিতাড়িত ১৪টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ৯০ জন। বরগুনার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন তারা। এখনো তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে দিনযাপন করছেন তারা।

বাংলাদেশী হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কি গীতার বাণী?

সেদিন ঢাকা প্রেস ক্লাবে হঠাৎ দেখা হাইকোর্টের সিনিয়র উকিল ও বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মী এ্যাড. রবীন ঘোষের সাথে। দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ায় প্রথমে সে কিছুটা আমার উপর রাগ দেখালেও পরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কফি শপে বসালো। বিভিন্ন নথিপত্র বের করছে, জিজ্ঞাসা করলাম কি এগুলো স্যার? বলতেই, আরো চটে গিয়ে বললো, তোমরা কি করছো, দেখেছো এই দুই মাসে ৫০টির উপর সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ আমার কাছে জমা হয়েছে। আমার বয়স হচ্ছে, আমার পক্ষে এই কাজ করা কতটা সম্ভব? কথা বলতে বলতেই আরো একটি খবর পাওয়া গেল, সাতক্ষীরার আশাশুনিতে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর ও তিনজনকে আহত করে দুর্বৃত্তরা (বাংলাদেশী ভাষা)। এমন ঘটনা এখন বাংলাদেশের মানুষদের জীবনের সাথে সহে গেছে। প্রতিনিই ২-৪টা শোনা যায়। যাইহোক সেদিন তার সাথে দেখার মূল বিষয়টি ছিল ১৪ বছরের একটি হিন্দু মেয়েকে জোরপূর্বক অপহরণ করার বিষয় নিয়ে। যদিও অনেক চেষ্টার পর উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৬ দিনের মাথায়। এখানেও বৃদ্ধ বয়সে এই মানুষটি এগিয়েছিলেন বলেই দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সত্যিই তো উনার বয়স হচ্ছে উনিও আর কত করবেন। আর আমাদের মত যুবক ছেলেরা শুধু অনলাইনে লাফাই, অফলাইনে কেমন যেন অফ হয়ে যায়। নিজেও আমি কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করবো বলে। কিন্তু আবেগটা বেশি স্থায়ী হল না। মাঠে কাজ করতে গেলে দেখলাম বেশ অর্থনৈতিক সার্পোটও থাকা দরকার, পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সাহায্যও প্রয়োজন হয়। তবে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম, বহির্বিশ্বের মানুষ যতটা না বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ে ভাবে, তার অর্ধেকও নিজ দেশীয় মানুষ ভাবে না। দিন দিন যে তাদের পায়ের নিচ থেকে আশ্রয়টুকু সরে যাচ্ছে, এতে যেন তাদের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নেই। এইতো বেশিদিন আগের কথা নায়, কুমিল্লার হোমনার ৪০টি হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘরে হামলাসহ মন্দিরে অগ্নিসংযোগ হল। দুইদিনের মাথায় গেলাম সেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে। ঘটনাস্থলে যাবার পূর্বে অবশ্য থানার ওসি সাহেব নিষেধ করল একা যেতে। উনিও গেলেন আমার সাথে। থানা থেকে ১০-১২ কিলোমিটার হবে। একবারে অজপাড়াগাঁ বললে চলে। এলাকায় তখনও থমথম পরিবেশ, ২ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা। সেখানে উপস্থিত তখন স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউএনও, ওসি ও একজন সার্কেল এএসপি। কি হয়েছিল মূলতঃ? শুনতে চাইলাম স্থানীয় লোকদের সাথে। এক বৃদ্ধা তখন কাঁদতে কাঁদতে বুকেই এসে পড়লো আর বললো কিছু হয়নি বাবা, আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ আমরা হিন্দু। কথা শুনে সেদিন যেন বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে গেল। কারণ ওই একই অপরাধে তো আমিও অপরাধী। আমার তো নতুন করে আর কোন অপরাধ করা লাগবে না। সেদিন সেই বৃদ্ধা যে অপরাধটির কথা বলেছিল। সেটি শোনার পরে উপস্থিত কর্মকর্তাদের চোখে দিকে তাকিয়ে দেখলাম তারাও যেন সেদিন অপরাধী হয়ে গেল। মাথাটা নিচু করে রইল সকলেই, দেখে মনে হল উনারা বুঝি মাটির ঘনত্ব মাপছেন।

আমি কর্মকর্তার কথা বাদই দিলাম, কারণ ওনারা এখনো অনেকেই ভাল আছেন। এইতো সেদিন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কথা তোয়াক্কা না করে লক্ষ্মীপুরের রামগতির হিন্দু পরিবারগুলোর ৯৮ শতাংশ জমি ফিরিয়ে দিলেন জেলা প্রশাসক। আমি চিন্তা করি এদেশের হিন্দুদের কথা। এরা তো কুয়োর ব্যাঙের চেয়েও খারাপ। কুয়োর ব্যাঙটাও তো মাঝে মাঝে কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে আশপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু এরা তো দেখছি পাশের বাড়ির মানুষটার কি হলো সেটাও দেখতে যায় না। সব থেকে বড় কথা সকাল হলেই ফুলের ডালা সাজিয়ে ভোগ-বাতাসা নিয়ে যে মন্দিরটিতে গিয়ে স্বর্গলাভ-চাকরী লাভ-সাংসারিক সুখ লাভ ইত্যাদি বলে ভগবান ভগবান বলে চিল্লা-পাল্লা তুলে দিয়ে ভক্তির মার্গের উচ্চদর্শনে গিয়ে সম্প্রতি বুলি ঝাড়ে। সেই তাদেরকেই আবার দেখা যায়, রাতে আধারে যখন সেই মন্দিরটি জ্বালিয়ে দেয়, তখন এরা ভক্তিমার্গ বাদ দিয়ে কাণ্ডজ্ঞান মার্গে ফিরে এসে ঘরের পিছন দরজা দিয়ে পালায়। কি একটা অদ্ভুত জাতি, এদের ঘরে আগুন লাগে, মন্দিরে আগুন লাগে কিন্তু মনে আগুন লাগে না। বাংলাদেশের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ কি? এই নিয়ে চিন্তা করছিলাম কাল রাতে বসে বসে। যদিও আমি খুব ক্ষুদ্র একজন, এই বৃহৎ চিন্তা করাটাও মনে হয় সমুচিন নয়। তারপরও বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম। দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করার পর যখন কিছু মাথায় আসলো না, তখনই আমার সেলফোনটি বেজে উঠলো এক সহকর্মীর কলে। তবে সেসময় আর ফোনটি ধরিনি। শুনছিলাম আমার ফোনের রিংটোনটি। গীতার শ্লোক, 'পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুস্কৃতম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।।'

আমার মনে হয় এই বাংলার হিন্দুরাও সেই আশায় বসে, 'যুগে যুগে' আসবে। কিন্তু বাস্তবতা বহুযুগ পার হয়েছে। সেই মহেঞ্জোদারো থেকে সিন্ধু সভ্যতা কতকিছুই না ধ্বংস হলো, মধ্যযুগের বর্বর আরবরাও এসে সীমাহীন অত্যাচারে ভারতবর্ষও খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তারপরও 'সম্ভবামি যুগে যুগে' সেই যুগের চিন্তায় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে দিব্যজ্ঞান ভরপুর হয়ে রইল মাস্টারদা সূর্য সেন, প্রীতিলতা, ক্ষুদিরামের এই বাংলার উত্তরসূরী হিন্দুগুলো।

(নটরাজ, বাংলাদেশ, ২৩-০৩-২০১৫)

হিন্দু শিক্ষার্থীদের গরুর মাংস খাওয়ালেন জামায়াত নেতা

বদলগাছী উপজেলা সদরের সোহাসা সূর্যমুখী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুস সাত্তার এক অনুষ্ঠানে রান্না করা গরুর মাংস কৌশলে স্কুলের হিন্দু শিক্ষার্থীদের খাইয়েছেন। বুধবার এ ঘটনায় এলাকার অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সানাউল হক বদলগাছী উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি তুহিন কান্তি চৌধুরী পঙ্কজসহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে বুধবার সকালে স্কুলে গিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ওই স্কুল থেকে প্রত্যাহার করেন এবং স্কুল ছুটি দেন। এছাড়া ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি। স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, ওই গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মজলিশের আয়োজন করা হয় মঙ্গলবার। ওই মজলিশে স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কোন দাওয়াত না থাকলেও ওই প্রধান শিক্ষক আব্দুস সাত্তার স্কুলের শিক্ষার্থীদের ওই বাড়িতে দাওয়াত আছে বলে খেতে পাঠায়। কোমলমতি শিশুরা জানত না সেখানে গো-মাংস রান্না হয়েছে। তারা প্রধান শিক্ষকের আদেশ মতো সেখানে মজলিশ খেয়ে বাড়ি ফেরে। বিষয়টি তারা অভিভাবকদের কাছে জানালে এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বুধবার হিন্দু অভিভাবকরা স্থানীয় থানা, ইউএনও, শিক্ষা অফিসসহ সংশ্লিষ্ট সকল দফতরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের এহেন সাম্প্রদায়িক নিকৃষ্টতা ও দায়িত্বহীনতার সুবিচার চেয়ে অভিযোগ করেছেন।

যা করবার, এখনই করতে হবে

পবিত্র রায়

কিছুদিন পূর্বে আয়মান আল জাওয়াহিরি হুমকি প্রদান করেছে, আলকায়েদা পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ নিয়ে এক বৃহত্তর মুসলিম সাম্রাজ্য বানাবার পরিকল্পনা করেছে। আল কায়েদা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রধানতম শত্রুদের একজন মনে করে। ওরা আমাদের এবং উপরোক্ত দেশগুলির ভিতর নাশকতা ও গণহত্যা চালাতে দ্বিধাবোধ করবে না। ভাষণ মাধ্যমে জাওয়াহিরি জানিয়েছে, আমাদের দেশে বহু কষ্টে আল কায়েদার সংগঠন বানাতে তারা সমর্থ হয়েছে। অন্যদিকে আই এসও ওদের সমর্থকদের মাধ্যমে কাশ্মীরে ওদের পতাকা প্রদর্শন করাতে সক্ষম হয়েছে। আই এস বাগদাদির নেতৃত্বে খিলাফত বানাতেও সক্ষম হয়েছে। আই এসও পতাকা প্রদর্শনের মাধ্যমে বুঝাতে পেরেছে যে ভারতবর্ষকে তারাও নিশানা করেছে। আল কায়েদা হোক, তালিবান হোক, আই এস হোক আর লস্কর-ই-তৈবাই হোক সবারই হুমকি ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে। প্রশ্ন হলো এরা ভারতের মত একটা সহনশীল রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য করে হুমকি দিচ্ছে কেন? হুমকি প্রদানের সাহসও বা পাচ্ছে কোথা থেকে?

এর কারণ অনেক গভীরে। প্রথমতঃ আমরা ভারতীয়রা তুর্কি শাসনের আমল হতে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনের শেষ ভাগ পর্যন্ত পরাধীনতায় থেকে, শাসন ও অত্যাচার ভোগ করে, সাহস ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। এর উপর আবার গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত এই সময়কালে আমাদের যে সব ধর্মগুরুগণ আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরাও যেটুকু আত্মবিশ্বাস ও সাহস ছিল তাতে বিভিন্ন আঙ্গিকে পেরেক ঠুকে গেছেন। তা সে আমরা শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শংকর যাঁকেই দেখি না কেন। পোপের নির্দেশে খৃষ্টান রাজন্যবর্গ এক হয়ে স্পেনকে উদ্ধার করে নিজেদের ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, আমাদের মহাপুরুষগণ আমাদের সমাজ এবং ধর্মকে আক্রমণকারীর পদতলে সমর্পণ করে, হোসেন শাহকে মহাপুরুষ বানায়। এইমত কৃষ্টিতে বহুকাল থাকার ফলে আমাদের মধ্যে এক সুপ্ত হীনমন্যতাবোধ সদাসর্বদা কাজ করতে থাকে। আর ফলস্বরূপ জুলফিকার আলী ভুট্টো বলতে পারে, ''হিন্দুস্তানী কুকুরগুলোকে আমরা হাজার বছর শাসন করেছি।'' হায়দরাবাদের ওয়াইসি মিঞা বলতে পারে ''পনের মিনিট পুলিশকে অকেজো রাখলে মুসলমানগণ হিন্দুদের সাবাড় করতে সক্ষম।'' কোন মহল হতে এদের বিপক্ষে বড় কোন প্রতিরোধ-প্রতিবাদের কথা শোনা গেছে কি? না, শোনা যায় নি। আর শোনা না যাওয়ার কারণ কি?

আমার দৃষ্টিতে এর মূল কারণ হলো হীনমন্যতা বোধ থেকে আমাদের মধ্যে বিচিত্র এক সমাজের উৎপত্তি হয়েছে। যারা সত্যকে সত্য বলবে না। মিথ্যাকে সত্য বলে চালান করবে, অথবা ঘটনা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবে, নিতান্ত পক্ষে ঘোরানোর চেষ্টাও করবো। এরাই আবার সমাজের উচ্চতর স্তর অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে বরেণ্য রাজনীতিবিদ-কলমচিও আছে। সম্প্রতি আই এস ও আলকায়েদার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ কলমবাজগণ বলতে শুরু করেছে, আই এস-এর উত্থানে আলকায়েদা অস্তিত্বহীনতার ভয়ে এইরূপ হুমকি প্রদান করেছে। অদ্ভুত যুক্তিই বলতে হয়! আই এস-এর উত্থান না হলে আলকায়েদা বোধহয় কোনদিনই এইরূপ হুমকি দিত না বা আই এস সৃষ্টির আগে কোনদিন আলকায়েদা এইরূপ হুমকি প্রদান করেনি, এই রূপই দৃষ্ট হয় যুক্তিটিতে। হ্যাঁ, এইরূপ অতিবুদ্ধির বুদ্ধিজীবি ও কলমচিগণই হুমতি দাতাদের ভরসাস্থল, এরা আছে বলেই আলকায়েদা-আই এস হুমকি প্রদান করতে সাহস পায়। তারা জানে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে এরা উগ্র ইসলামের সমর্থক হয়ে কাজ করবেই। সুতরাং হুমকি প্রদান ও কার্যে পরিণত করতে বাধা কোথায়!

অতঃপর সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই কলমবাজগণ কি কিছুই বোঝে না! আমার মত হলো এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে যারা কিছুই বোঝে না, একটি গোষ্ঠী বোঝে কিন্তু ঘটনা প্রবাহকে মিথ্যা যুক্তি দ্বারা খণ্ড করে, আর তৃতীয় একটি গোষ্ঠী আছে যারা সোজাসুজি চামচাগিরি করে। কথাগুলি একটু রূঢ় হলো, দুঃখিত, কিন্তু কিছুই করার নেই। এরা বর্তমানকালে আলকায়েদার হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে যে যুক্তি আলকায়েদার সপক্ষে প্রদান করেছে, তাতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এরা কি সত্যিই ইসলামের উগ্রমূর্তি সম্পর্কে অবহিত নয়! আলকায়েদা হতেই আই এস-এর উত্থান। আই এস, আলকায়েদা, হুজি, লস্কর-ই-তৈবা, ইসলামিক ব্রাদারহুড, তালিবন, লস্কর-ই-জংভি এবং আরও বহু ছোট ছোট ইসলামিক সংগঠন সবই এক ছাতার তলায় এবং একই উদ্দেশ্যে অবস্থিত, এই সাধারণ কথাটা কি এরা সত্যিই জানে না! আই এস এবং আলকায়েদার মুখোমুখি লড়াই তো কোন চাতুরীও হতে পারে? আমাদের ভুল বোঝানোর জন্য হয়তো বা এইরূপ চাতুরী। যেমন আমরা বুঝলাম ওরা নিজেদের মধ্যে লড়ছে, শক্তিক্ষয় হচ্ছে, সুতরাং কিছুই করে উঠতে পারবে না, আমরা গা ছাড়া দিয়ে অসতর্ক রইলাম। আর সেই সুযোগে ওরা আমাদের চরম সর্বনাশটি করে ফেলল! ভগবান না করুন, এই মত কখনো হলে তখন এই কলমচিগণই আবার ওদের দোষ থেকে রেহাই প্রদান করে রাষ্ট্রযন্ত্রকেই কাঠগড়ায় তুলবে, যেমন কারগিল কাণ্ডের পর করেছিল, ১৯৬২ সালের চীন যুদ্ধের পরও এইরূপ করেছিল। বাম সমর্থক কলমবাজগণ ১৯৬২তে বলেছিল, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছিল, ভারতই চীনের জায়গা দখল করে আছে। আর কারগিল কাণ্ডের সময় বলেছিল, ''কারগিল নয়, কার গিল্ট?''

বর্তমানকালে একটি কথা বহুল প্রচারিত। কথাটি হল ''স্লিপার সেল''। এই বুদ্ধিজীবি এবং রাজনীতিগণই খুব সম্ভবতঃ ইসলামী উগ্রবাদের স্লিপার সেলের অগ্রণী সৈনিক। যেহেতু এরা শিক্ষিত, তাই এরা নিজেদের কু-শিক্ষাকে কলমের মাধ্যমে বিকৃত করে জনগণের নিকট মিথ্যা পরিবেশন করে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে আমাদের একজন বরেণ্য সাংবাদিক, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এর সময় বৃটেনে রাষ্ট্রদূত, যার জন্ম পাকিস্তানে, বর্তমানে ভারতীয়, অথচ নিজেকে পাকিস্তানী বলে পরিচয় প্রদান করেও গর্ববোধ করে, কিছুদিন পূর্বে উক্ত মহামানবটি তার একটি লেখায় লিখেছিল, ''ভারতে মুসলমানগণ হাজার বছর ধরে নিপীড়িত।'' জুলফিকার আলী ভুট্টো বলছেন হাজার বছর ধরে ইসলাম ভারত শাসনের সাথে নিপীড়ন করেছে। আগমার্কা পাকিস্তানীটি বলছে মুসলমান নিপীড়িত। এইরূপ কথা লিখে উক্ত সাংবাদিকটি কার স্বার্থরক্ষা করেছে। সেটা আর বলার দরকার হয় না বোধকরি।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারতীয় জনগণ ও ভারত সরকারকে সঠিকভাবে ও সুস্থ মস্তিষ্কে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে। প্রয়োজনে এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রো-অ্যাক্টিভ নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ইসলামের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারেন নি। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা ঠেকে শিখেছি এবং জেনেছি ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সারা পৃথিবীতে একটিই মাত্র ধর্ম থাকবে, যার নাম ইসলাম। আর সেই উদ্দেশ্যেই

শেষাংশ ৭ পাতায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লাভ জেহাদের আদ্যোপান্ত ঃ মহসিনা খাতুন

তাই সবশেষে, অনেক ভাবনাচিন্তার পর এই সমস্যার সমাধান বিষয়ে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করব (অবশ্য অন্যপথ থাকতেই পারে, আমি অস্বীকার করছি না বরং এই বিষয়ে আপনাদের মতো বিদগ্ধজনের ভাবনাও জ্যনতে চাইছি)। ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে আলোচনার চেষ্টা করবো, এই 'লাভ জেহাদ' কে কিভাবে রুখে দেওয়া যায়। যদিও খ্রিষ্টান সংগঠনগুলো অনেক আগেই লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা একাধিক জায়গায় ক্যাম্পেইনিং ও শুরু করছে। কিছু কিছু জায়গায় তারা স্থানীয় হিন্দু সংগঠন গুলোর সাথে মিলে একসাথে প্রচার করছে। কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষে প্রচারের পক্ষে এরা অতি নগন্য। তবে ৮০ শতাংশ হিন্দুর দেশে এই বিষয়ে যারা কিছু করতে পারত, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন বলে যারা গর্ববোধ করে, সেই বহু বিতর্কিত হিন্দু সংগঠন R.S.S. এর দৃষ্টিভঙ্গি শুনে অবাক হলাম। তাদের কিছু পূর্ণকালীন প্রচারক কে তাদের ভাবনা জিজ্ঞেস করায় যা উত্তর পেলাম তাতে হাসির উদ্রেক হল। তারা সকলেই ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কিন্তু তারা একটি অবাস্তব সমাধানের কথা বলছে। তাদের মতে সমাধান নাকি একটাই, সমস্ত হিন্দু মেয়েদের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-এর সাথে যুক্ত হতে হবে!! এই প্রস্তাব তো অসম্ভব। অধিকাংশ মেয়েকে সংগঠনে আনা যদি সম্ভব হয়ও তাহলে সে কয়েকশ বছর সময় সাপেক্ষ। ততদিনে তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। ততদিনে ওরা কৌশলও বদলে ফেলবে নিশ্চিতভাবে। অন্য একজন প্রচারক আবার গর্ব করে বললেন, ''দেখুন, যেখানে যেখানে শাখা (সঙ্ঘের রোজদিনের অভ্যাস-কাজ) নিয়মিত চলে সেখানে সেখানে লাভ জেহাদের উপদ্রব কম।'' অর্থাৎ যতদিন শাখা চলবে ততদিন উপদ্রব কম থাকবে, শাখা বন্ধ হলেই আবার বাড়বে। অনেকটা যেন পেইন কিলার খেয়ে ব্যথা কমানোর মতো এই পন্থা! রোগ তো সারবেই না, উল্টে সমস্যা বাড়বে।

তাহলে সমাধান কি? বেশ কিছুদিন এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করে একটা সমাধানে এসেছি যে, এটি এমন একটি সমস্যা যার সমাধানের হয়ত একটাই পথ - ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন নিয়ে সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে চর্চা। এই চর্চা দুইভাবে হতে পারে। এক, বিভিন্ন আক্রান্তার সাক্ষাৎকার সহযোগে লাভ জেহাদ বিষয়ে সকল স্তরের অমুসলিম মেয়েদের সরাসরি সতর্ক করা। দুই, কোনও অমুসলিম মেয়ে যদি কোনও মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করে মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট এর মাধ্যমে ধর্মান্তরিত না হয়ে কিম্বা ধর্মান্তরিত না হয়ে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট এর মাধ্যমে, তাহলে তাদের বিবাহিত জীবনে কি কি সামাজিক ও আইনগত সমস্যা আসতে পারে সেগুলি নিয়ে জনসমক্ষে খোলামেলা প্রচার চালানো। 'মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' -এর কল্যাণে(!) চার বিবাহ আইন, মুসলিমদের পতির সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার কত কম, তাছাড়া পুরুষের তালাক দেওয়ার অতি সহজ পদ্ধতি, তালাকের পরে খোরপোষের কোনও আইন নেই, পারিবারিক হিংসা রোধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া যায় না...ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অমুসলিমদের বিশেষত অমুসলিম মেয়েদের দৃষ্টির সামনে এনে দেওয়া। কিন্তু এই কাজ করবে কে?

কোনও ব্যক্তি বা ছোট কোনও গোষ্ঠীর পক্ষে এই কাজ করায় যথেষ্ট সমস্যা আছে। সাম্প্রদায়িকতা এবং ইসলাম বিরোধিতার অভিযোগ উঠতে বেশি দেরী হবে না। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন এবং মুসলিম ভোটব্যাঙ্কলোভী রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা হবে, যার মোকাবিলা করার সামর্থ্য তাদের থাকবে না। তাই এই কাজের জন্য একমাত্র যোগ্য হল দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ এবং সমর্থ সংগঠন দ্বারা পরিচালিত বা সমর্থিত এক বা একাধিক সর্বভারতীয় প্রিন্টেড মিডিয়া এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া যা পৌঁছে যাবে সমর্থক বা সমালোচক নির্বিশেষে দেশের সকলস্তরের মানুষের মধ্যে।

এই পদ্ধতিও খানিকটা সময়সাপেক্ষ, কেননা ভারতবর্ষে বড় বড় হিন্দু সংগঠন থাকলেও সকলেই 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যাত হওয়ার ভয়ে ভীত। এমনকি R.S.S. যাদের গা থেকে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা কোনোদিন উঠবে না, তারাও আজ 'অসাম্প্রদায়িক' হয়ে উঠতে চায়! তাই সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ এড়িয়ে দ্রুত কাজ করতে হলে একটাই উপায়- অভিন্ন দেওয়ানী বিধি বা 'Uniform Civil Code' বিষয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেল গুলোতে বিশিষ্ট জনেদের নিয়ে বিতর্কসভার আয়োজন করতে হবে। কোন রাখঢাক না করে সরাসরি খোলামেলা আলোচনা হলে কিছুদিনের মধ্যেই অভিন্ন দেওয়ানী বিধির পক্ষে প্রবল জনমত গঠিত হবে। অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু হলে মুসলিম মেয়েরা প্রতিবাদের ভাষা পাবে। অন্যদিকে অযৌবন জেল খাটা যে কবর- আযাবের চাইতে অনেক বেশি কষ্টকর, সেটা সাধারণ মুসলিমরা ভাল করেই জানে। সুতরাং তারাও একটা বিয়েতে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হবে। অন্যদিকে, প্রাথমিক ভাবে অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু হোক বা না হোক, এই বিষয়ে সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক মিডিয়ায় আলোচনা হলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামিক শরিয়া আইনের কথা কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। ফলে আলোচিত হবে শরিয়া আইনের নানা দিক। শরিয়া আইন কি জিনিস, তা ভারতের সাধারণ আইনের থেকে কতটা পৃথক, জাতীয় সংহতির পক্ষে তা কতটা অন্তরায় - এগুলি যেমন আলোচিত হবে, তেমনি একজন অমুসলিম মেয়ে মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করলে বা ইসলামে ধর্মান্তরিত হলে তার যে ধরণের সামাজিক এবং অইনগত সমস্যা তৈরি হবে সেই সম্পর্কেও অমুসলিম জনসমাজের একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠবে। এই সচেতনতাই লাভ জেহাদি কার্যকলাপকে শেষ করে দিতে সক্ষম হবে।

(সমাপ্ত)

নোয়াখালী হিন্দু হত্যাযজ্ঞ ঃ সংখ্যাগুরুর নিকৃষ্টতা এবং সংখ্যালঘুর আর্তনাদ

১০ অক্টোবর, ১৯৪৬, নোয়াখালী

শারদীয়ার আনন্দোৎসব মলিন হতে না হতেই পূর্ব বাংলার হিন্দু জনপদে এসে হাজির কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। স্বাভাবিকতই উৎসবের আনন্দে ভাসছিল গোটা বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠী। পর পর এমন আনন্দের উপলক্ষ্যতে নোয়াখালীর হিন্দু ঘরগুলিতেও চলছিল লক্ষ্মীপুজোর সাড়ম্বর আয়োজন। ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী হিসেবে, পারিবারিক ধনসম্পদ অর্জনের মানসে লক্ষ্মীপুজোর প্রচলনটাও ছিল সকল হিন্দুদের ঘরে ঘরে। প্রদীপ জ্বালিয়ে, সুগন্ধী ধূপে চারপাশ ময়ময় রেখে, শঙ্খ বাজিয়ে তাই মা'কে আহ্বান জানাচ্ছিল নোয়াখালীর হিন্দুরা—হয়তো বাড়ির উঠোনে, ঘরের মেঝেতে দেবী লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ ও ধানের ছড়া এঁকে দেবীর প্রতি অর্ঘ্য নিবেদনের শেষ প্রস্তুতি নিচ্ছিল তল্লাটের উপবাসিত হিন্দু মহিলাগুলো। অপেক্ষারত নির্মম নিয়তি সম্বন্ধে স্বাভাবিকভাবে এদের কারো ধারণা ছিল না।

এদিকে, মুসলিম লীগের প্রাক্তন বিধায়ক গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে এদিনই এক জরুরি মিটিং ডাকা হয় বেগমগঞ্জ বাজারে। উক্ত সভাটিতে স্থানীয় পুলিশ পরিদর্শকের উপস্থিতিতেই মুসলিম লীগ নেতা সারোয়ার হিন্দু বিরোধী প্রবল বিদ্বেষমূলক বক্তব্য রাখতে শুরু করেন, এক পর্যায়ে এই মুসলিম লীগ নেতা কোরানের একটি আয়াত উদ্ধৃত করার মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলের সকল কাফির মুর্তাদ এবং মূর্তি পূজারকদের কতল করার নির্দেশ প্রদান করেন, পরিকল্পিতভাবেই উপস্থিত মুসলিম জনসাধারণকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়া হল হিন্দু জনপদে আক্রমণ চালানোর জন্য। সভা শেষ হতেই, উত্তেজিত মুসলমানদের একটি বিশাল গ্রুপ স্থানীয় হিন্দু দোকানপাটগুলোতে হামলা এবং লুটপাটের পর আগুন ধরিয়ে দেয়।

অন্যদিকে উত্তেজিত মুসলমানদের আরেকটি গ্রুপ হামলা চালায় স্থানীয় হিন্দু নেতা সুরেন্দ্র কুমার বসু-র বাড়িতে। মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের এ হামলায় সুরেন্দ্র বাবুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তার অফিস কক্ষে এবং বসত বাড়িটিতে। বিভিন্ন জায়গা থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ১০০ জন হিন্দু সেসময় বাড়িটিতে অবস্থান করছিলেন, জীবিত অবস্থায় এদের উপরও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল—আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী ও শিশু। সৌভাগ্যক্রমে যে লোকগুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিল এদেরও শেষরক্ষা হয়নি, ধারালো অস্ত্রের মুখে এদের কুপিয়ে হত্যা করে বাইরে অপেক্ষারত মুসলিম লীগের সন্ত্রাসীরা।

হামলাকারীদের শেষ গ্রুপটি হানা দেয় জেলা বার সভাপতি ও প্রখ্যাত হিন্দু বুদ্ধিজীবী রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়িতে। রাজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং বাস্তববাদী একজন মানুষ। নিরীহ আত্মসমর্পণের পথ বেছে না নিয়ে, শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার প্রত্যয় তার মধ্যে ছিল। এসময় নিজ পুত্র, ভাইদের সাথে নিয়ে পাড়ার সমস্ত হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। প্রাথমিকভাবে হামলাকারীরা প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাই পিছু হটতে বাধ্য হয়। হামলা ব্যর্থ হলে মুসলিম লীগের হানাদাররা রাগে ফুঁসতে থাকে এবং পুনরায় অধিক সংখ্যক হামলাকারীদের সমাবেশ ঘটিয়ে পার্শ্ববর্তী হিন্দু গ্রামগুলোতে তীব্র আক্রমণ করা শুরু করে। গ্রামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং মন্দিরগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হামলা প্রতিরোধ করার আয়ত্ত্বের বাইরে চলে গেলে রাজেন্দ্রলাল রায় জেলা পুলিশ স্টেশনে বিষয়টি অবগত করেন। নিরীহ হিন্দু জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা চাইলে এসময় পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে তা উপেক্ষা করা হয়। প্রাণে বাঁচার তাগিদে রাজেন্দ্র বাবু এসময় নির্গমনের রাস্তার খোঁজ করতে থাকেন। অবস্থার খুব দ্রুত খারাপের দিকে ধাবিত হতে থাকে। গ্রামের প্রতিটি রাস্তা-ঘাট, নদীর ঘাট, নৌকার জটলায় মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের প্রহরায় বসানো হয়েছে। একটি মালাউনও যেন প্রাণে বাঁচতে না পারে, এমন নির্দেশ পরপরই মুসলিম লীগের গুণ্ডারা আরও হন্যে হয়ে ওঠে। আশাহীন এমন পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় রাজেন্দ্র রায় এলাকার সমস্ত হিন্দুদের নিয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে শেষ পর্যন্ত তারা লড়ে যাবেন। পরদিন সকালে মুসলিম গুণ্ডাদের আরও একটি বিশাল অংশ আক্রমণে অংশ নিলে, রাজেন্দ্রবাবুর যোগ্য নেতৃত্বে এযাত্রাও হিন্দুরা মুসলিম লীগের সমর্থক বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়। বৃষ্টির মত পাথর ছুঁড়েই হামলাকারীদের কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছিল। এদিকে ঘটনার অনেকখানি সময় পার হয়ে গেলেও সরকার কিংবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে কোনপ্রকার সাড়াশব্দ ছিল না, এক্ষেত্রে উভয় পক্ষই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিল। অন্যদিকে সময়ের সাথে শত্রুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হিন্দুদের গোলাবারুদও শেষ হবার পথে। তথাপি হিংস্র মুসলিম দাঙ্গাকারীদের মধ্যে থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। একের পর এক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হলেও, প্রতিবারই এরা আরও অধিক সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে ফিরে এসে দ্বিগুণ হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলাম সারোয়ারের ব্যক্তিগত নির্দেশেই হামলাকারী বারবার হামলা চালিয়ে যেতে থাকে, শেষমেশ স্থানীয় হিন্দুদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে মুসলিম লীগের সমর্থকেরা হিংস্র হায়েনার মত হিন্দুদের উপর আক্রমণ করতে শুরু করে।

রাজেন্দ্রবাবুকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পর হিন্দুদের মনোবল আরও ভেঙে পড়ে। হামলাকারীদের আক্রমণে হতভম্ব হয়ে উঠলে প্রতিরোধের সকল চেষ্টা ভুলে গিয়ে নিরুপায়ের মত রণে ভঙ্গ দেয় হিন্দুরা। মুসলিম লীগের হামলাকারীরা এসময় অঞ্চলের সমস্ত হিন্দুকে জবাই করে হত্যা করে, রাজেন্দ্র রায়ের ছেদ করা মস্তক সিলভার প্লেটে তুলে নিয়ে উপহার হিসেবে দেয়া হয় গোলাম সারোয়ারকে। তারই আদেশে তার দুই বিশ্বস্ত চ্যালা রাজেন্দ্রবাবুর সুন্দরী মেয়েদুটিকে গণিমতের মাল হিসেবে গ্রহণ করে। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া রাজেন্দ্র পরিবারের একমাত্র সদস্য ছিলেন এম এল রায়। সম্পর্কে যিনি রাজেন্দ্র রায়ের ছোট ভাই ছিলেন। ঘটনার সময় কলকাতা কলেজে অবস্থানের কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। পরবর্তী সময় তার জবান অনুযায়ী জানা যায় যে, ''মুসলিমরা নোয়াখালীর সমস্ত হিন্দু জনপদকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার পক্ষে ছিল, যে কারণটিতে প্রথমেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় এলাকার প্রভাবশালী হিন্দু নেতারা—যাদের দ্বারা সামান্য হলেও হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার সামর্থ্য ছিল। আমার সমস্ত পরিবারের মৃত্যুর কারণও ছিল এটিই। প্রায় চার সপ্তাহব্যাপী হিন্দু বিরোধী এই জেনোসাইড একে একে ছড়িয়ে পড়ে রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া, নোয়াখালী, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম, চৌদ্দগ্রামে সহ ন্যূনতম হিন্দু বসতিপূর্ণ অনেক এলাকাতে। এসব এলাকায় শত শত হিন্দু নারী, অল্পবয়স্ক মেয়েদের জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয়, হাজার হাজার নারী পুরুষকে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয়। যেসব পরিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণে রাজি হত না, সেসব বাড়ির হিন্দু মহিলাগুলোক মাটিতে চিত করে ফেলে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হত, পা দিয়ে মারিয়ে ভেঙে দেওয়া হত হাতের শাঁখা। এরপর হত্যা করা হত তাদের স্বামী ও সন্তানকে। যেসব অঞ্চলে জোর পূর্বক ধর্মান্তরকরণ করা হয়নি ওসব এলাকাতে চালু করা হয় আরও জঘন্য এক ইসলামিক প্রথা, যাকে বলা হত জিজিয়া কর। ঐ অঞ্চলে বসবাসরত সকল হিন্দুদের মুসলিম লীগের নেতাদের নিকট জিজিয়া কর দিয়ে বসবাস করতে হত। প্রাথমিকভাবে মুসলিম দাঙ্গাবাজদের সুপরিকল্পিত হামলায় প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু নরনারীকে হত্যা করা হয়েছে বলে বলা হলেও, এর প্রকৃত সংখ্যা কখনোই ২০,০০০ হাজারের নিচে নয়। শুধুমাত্র নোয়াখালীতেই হত্যা করা হয়েছে প্রায় পাঁচ থেকে সাত হাজারের উপরে, যার মধ্যে বেগমগঞ্জ থানা ছিল সর্বাধিক হিন্দু ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। হামলার জন্য নোয়াখালী এবং কুমিল্লা জেলাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল দূরত্বগত জটিলতার সুবিধা কলকাতাভিত্তিক মিডিয়াগুলো থেকে জেনোসাইডের প্রকৃত তথ্য আড়াল করে রাখা।

অক্টোবরের শেষ নাগাদ, বেঙ্গল প্রেস এডভাইসরী কমিটির থেকে পূর্ব বাংলার হিন্দু নেতা রাজেন্দ্রলাল রায়ের মৃত্যুর পর পূর্ব বাংলার হিন্দুদের এইসব এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর অবস্থার উল্লেখ পূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় রায় বাবুর মৃত্যুর সাথে নেতৃত্বহীন হিন্দুদের উপর নির্যাতনের অনুপাত প্রভূত বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পূর্বের সকল নির্যাতনকে হার মানায়। প্রতিবেদনটিতে পাঁচগাও গ্রামের এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের ভোগান্তির করুণ দৃশ্য তুলে ধরা হয়। ব্রাহ্মণ পরিবারটিতে ছিল চার ভাই। কুরবানি ঈদের দিন একটি গাভীকে তাদের মন্দিরের আঙ্গিনায় জবাই করা হয় এবং তাদের কাছে টুকরা করা ঐ গরুর মাংস পাঠানো হয়। উক্ত ঘটনায় গভীর ব্যথা ও অন্তর্বেদনার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্যরা বমি করতে শুরু করলে, স্থানীয় উগ্রপন্থী মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ পরিবারটিকে অভিশাপ দেওয়ার পাশাপাশি তারা আলোচনা করতে থাকে কেমন করে কাফির মুসরিকরা আল্লাহ্‌র প্রতি উৎসর্গীকৃত গরুর মাংস প্রত্যাখ্যান করতে পারে। স্থানীয় গ্রাম্য সালিশে তাই তাদের বিচার নিশ্চিত করা হয়, এবং বিচার মৌলভি সাহেব পরিবারটিকে কথিত অপরাধের জন্য ২৫০ টাকা জরিমানা করেন এবং কদিনের মধ্যেই তা শোধ করার ফতোয়া দান করেন। হত্যাযজ্ঞের কয়েকদিন পর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আচার্য্য কৃপালিনী পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য নোয়াখালীতে যান এবং ঘটনাস্থল ঘুরে এসে তিনি এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করেন যাতে বলা হয়, সম্পূর্ণ দাঙ্গা প্রক্রিয়াটাই ছিল মুসলিম লীগের কর্তৃক পরিচালিত এজেন্ডার অংশবিশেষ, যাতে পরিকল্পিতভাবে ও সুসংগঠিত হয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো হয়েছে। কৃপালিনীর স্ত্রী সুচেতা এই ঘটনার ভয়াবহতায় ব্যথিত হন, এবং সমস্ত নোয়াখালী চষে বেড়ান হিন্দু নারীদের উদ্ধারের তাগিদে। দাঙ্গার খলনায়ক গোলাম সরোয়ার এসময় ফতোয়া দেয়, যে সুচেতাকে ধর্ষণ করতে পারবে তাকে বহু টাকা দেওয়া হবে এবং গাজী উপাধিতে ভূষিত করা হবে। যে কারণে সুচেতা সবসময় পটাসিয়াম সায়নাইড ক্যাপসুল গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন বলা যায়। ঘটনার প্রায় ১ মাস পর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালীতে ক্যাম্প করেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় নোয়াখালীর বিভিন্ন প্রান্তে চষে বেড়ান (!!!)। যদিও তার এই প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যা করবার, এখনই করতে হবে

৬ পাতার শেষাংশ

ওরা এদেশে স্লিপার সেল বানাচ্ছে। ভারত সরকার এবং ভারতীয়দের প্রথম কাজই হওয়া দরকার স্লিপার সেলের সদস্যদের খুঁজে বের করা, চিহ্নিতকরণ করা।

মনে রাখা উচিত ভারতীয় মানসিকতায় ইসলামী উগ্রবাদ মোকাবিলা সম্ভব নয়। সহনশীল ভারতীয় আইনে বন্দী জঙ্গিকে বিচার ব্যবস্থায় আনা হয়। আই এস-আলকায়েদা কিন্তু ওটা করে না। চরম নৃশংসভাবে হত্যা করে সেই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়। নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করায় সভ্য পৃথিবীকে। ইহার ফলও হয় মারত্মকভাবে। আই এস জঙ্গিরা যখন অপ্রতিরোধ্য গতিতে ইরাকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সরকারী সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী বহুক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল কেন, কেউ কি একবার ভেবে দেখেছেন? কারণ ছিল পলায়নপর সৈন্যরা জানত ধরা পড়লে ঐরূপ নৃশংসতার শিকার তাদেরও হতে হবে।

অর্থাৎ যুদ্ধজয়ে নৃশংসতার ভূমিকাও অনস্বীকার্য। নৃশংসতার জবাব চরম নৃশংসতায় দেওয়া উচিত। নৃশংসতার বহর দেখে নৃশংস উগ্রবাদীগণও যেন চমকিয়ে ওঠে। আর তখনই ওরাও অস্ত্র ছেড়ে পলায়ন করবে। আই এস হোক আর আলকায়েদাই হোক সদস্য যোগাড় করতে সক্ষম হবে না। আরও একদল মানুষের প্রতি কড়াভাবে নজর রাখা উচিত। তারা হল, যারা এই উগ্রপন্থীদের নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন জোগান দিচ্ছে। উগ্রপন্থীদের কোন অস্ত্র কারখানা নেই। সাধারণ সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ দিয়ে কালোবাজার থেকে এরা অস্ত্র ক্রয় করে। এইরূপ সহানুভূতি প্রবণ মানুষেরা উগ্রপন্থীদের চাইতেও ভয়ঙ্কর।

পরিশেষে তলস্তয়-এর প্রদান করা একটি শিক্ষামূলক নিবন্ধ থেকে কিছু কথা জানাচ্ছি। তলস্তয় তিনটি প্রশ্ন ও তার উত্তর দিয়েছিলেন। প্রশ্ন তিনটি হলো (১) মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সময় কি, (২) গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি ও (৩) গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম কি? ঘটনার মাধ্যমে তলস্তয় তাঁর লেখনীর দ্বারা উত্তর দিয়েছিলেন (১) গুরুত্বপূর্ণ সময় এখন, (২) গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনি যা করতে হবে, (৩) গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম ক্ষমা। তিন নং প্রশ্ন ও উত্তর তখনই প্রযোজ্য হতে পারে যখন শক্তির শিয়রে বসে শাস্তি বিতরণের ক্ষমতা থাকে। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্ন ও উত্তর বাদ রেখে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন ও উত্তরে এই মুহূর্তে বিধান খোঁজা উচিত। হ্যাঁ, অকপটেই বলতে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সময় এখনই, আর যা করবার তা এখনি করতে হবে। না হলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে বোধকরি।

আলকায়েদার হুমকি যেন কোনভাবেই হালকা করে দেখা না হয়। এখন থেকেই ওদের উপর কড়া পদক্ষেপ হিসাবে যা যা করণীয়, ভারত সরকার সেইমত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করুক।

ভাতার থানা ঘেরাও করল হিন্দু সংহতি

বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত ওরগ্রাম থেকে গত ৩০শে মার্চ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল ১৬ বছরের বিউটি রায় (নাম পরিবর্তিত)। পরেরদিন বিউটির বাবা বিশেষ সূত্রে খবর পান যে তার মেয়েকে গ্রামেরই শেখ রঞ্জন, পিতা-শেখ মঙলা, ফুঁসলিয়ে নিয়ে গেছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে ভাতার থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান অপহৃতার বাবা। কিন্তু অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে ভাতার থানার পুলিশ। তখন হিন্দু সংহতির ওরগ্রাম শাখার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন বিউটির বাবা। ৬ এপ্রিল, সকাল ১০টা নাগাদ ভাতার থানা ঘেরাও করে ওরগ্রাম, ভাতার ও বর্ধমান শহরের সংহতি কর্মী-সমর্থকরা। প্রায় ২০০ কর্মী সমর্থকদের চাপের সামনে নতিস্বীকার করে ভাতার থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর. দায়ের করতে বাধ্য হন। বর্ধমানের লড়াকু হিন্দু নেতা অমিত রায় জানান, অভিযুক্ত রঞ্জন শেখ এবং অপহৃতা বিউটিকে আদালতে পেশ করার জন্য পুলিশকে সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় আন্দোলন বৃহত্তর রূপ ধারণ করবে।

কলকাতায় লেখকের উপর প্রাণঘাতী হামলা

কলকাতার মেটিয়াবুরুজ এলাকার একটি মাদ্রাসার শিক্ষক মাসুম আখতার। মুক্তমনা এই শিক্ষক শিক্ষকতার পাশাপাশি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। কিছুদিন আগে তার স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে ঘেরাও করে হেনস্থা করেছিল ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলার অভিযোগে। গত বছর দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় কারবালার যুদ্ধের উপরে তার একটি লেখাও প্রকাশিত হয়। এর পর থেকেই আসতে থাকে টেলিফোনে হুমকি। কিন্তু শুধু হুমকিই নয়, শেষ পর্যন্ত গত ২৬শে মার্চ তার উপরে হামলা করে মুসলমানেরা। তিনি প্রচণ্ডভাবে আহত হন। প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁর আঘাত গুরুতর। এদিকে মারধোর করার পরে আক্রমণকারীরাই তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, মুসলিম সমাজের আবেগে আঘাত করেছেন তিনি। আহত মাসুম আখতার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, তিনি তার উপর প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কা করছেন। নিরাপত্তার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে তিনি জানান।

শিক্ষাঙ্গনে ইসলামি জঙ্গীদের বর্বরোচিত আক্রমণ

কেনিয়ায় মুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠী আল শাবাবের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় নিহত ১৪৭ শিক্ষার্থী। হামলার সময় বেছে বেছে অমুসলিম শিক্ষার্থীদেরকে আলাদা করে হত্যা করা হয়।

কেনিয়ার গ্যারিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে আল-শাবাব গোষ্ঠীর বন্দুকধারীদের হামলায় ১৪৭ জন নিহত হয়েছে বলে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে। কেনিয়ার উত্তর পূর্বের সোমালিয়া সীমান্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকারীরা ভোরে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হত্যা করে।

নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৫০০ জন ছাত্রকে উদ্ধার করে বলে দেশের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। কেনিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছেন নিহতদের মধ্যে চারজন হামলাকারীও রয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান শেষে হয়েছে এবং তারা ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পার্শ্ববর্তী দেশ সোমালিয়ার আল শাবাব জঙ্গি সংগঠনের নিয়মিত লক্ষ্যবস্তুতে রয়েছে কেনিয়া। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে একজন পুলিশ সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন পাঁচজন মুখোশপরা বন্দুকধারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। কেনিয়ার রেড ক্রস বলছে প্রায় ৫০ জনের মত শিক্ষার্থী বের হয়ে আসতে পেরেছে। তবে সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও বেশ কয়েকজন ভিতরে আটকা রয়েছে বলে জানাচ্ছে সংস্থাটি।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ২

গত ২৪শে মার্চ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সকাল আটটা নাগাদ চাকদহ বাসস্ট্যান্ড থেকে আবদুল রউফ মণ্ডল এবং রহিম মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সম্ভবত তারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতদের কাছ থেকে ১০টি অত্যাধুনিক পিস্তল, ২০ রাউন্ড গুলি এবং পিস্তল তৈরির ২০টি স্পিং উদ্ধার করা হয় বলে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন। ধৃতদের বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ এই প্রতিবেদনের প্রতিনিধিদের জানায় উন্মুক্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। এটি আশঙ্কার।

গরু পাচারের অভিযোগে এস আই-কে মারধোর

সীমান্তে গরু পাচারকে কেন্দ্র করে রাজ্য পুলিশ ও বিএসএফ-এর সংঘর্ষ হয় মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে। জওয়ানদের হাতে মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি জলঙ্গি থানার এক এস আই।

জলঙ্গির সরকার পাড়ায় পুলিশ হানা দিলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় পুলিশকে আক্রমণ করে বিএসএফ জওয়ানরা। আহত হন একজন এস আই। গ্রামবাসীরা জানায়, গ্রামের এক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গরু পাচারে অংশ নেয় জলঙ্গি থানার পুলিশ কর্মীরা। গ্রামবাসী ও বিএসএফ কর্মীরা পাচারে বাধা দিলে ঝামেলা শুরু হয়। পুলিশের বিরুদ্ধে গরু পাচারের অভিযোগে থানায় বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা।

ফুরফুরায় আদিবাসীদের তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা

শক্তি সাধনা জনজাতি সমাজের পরম্পরা। এই পরম্পরা তারা আজও বজায় রেখেছে যত্ন সহকারে। তাই আজও তীর ধনুকের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই সাঁওতালদের মধ্যে। ফুরফুরা খাঁপখরী মারাংবুরু ক্লাব আয়োজিত তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা তারই প্রতীক স্বরূপ। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ফুরফুরা শ্মশানকালী পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা। গত ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় জনজাতি ভাই-বোনেরা উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে। প্রায় ১০০ ফুট দূরে লক্ষ্যবস্তুরূপে রাখা হয়েছিল কলাগাছের মাঝের অংশটি। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ঐ 'থোর'কে নিশানা করে তীর ছুঁড়তে হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শুধু পুরুষরা নয়, যুবতী মেয়েরাও তীর ছোঁড়ায় যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখায়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাথে হিন্দু সংহতির স্থানীয় কর্মকর্তা আশীষ মান্না উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিনি আদিবাসী সমাজের এই উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন।

মহারাণা প্রতাপ সিংহ-র জন্মতিথি —২১শে মে "ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস"

কোথায় রাজস্থান কোথায় বাংলা। মাঝখানে ১৫০০ কিমি দূরত্ব। তবু বাঙালির মনে আজও সাড়া জাগায় হলদিঘাটের যুদ্ধ, রাণাপ্রতাপ, চৈতক ঘোড়া, ছোট্ট মেয়ের ঘাসের রুটি বিড়ালে টেনে নিয়ে যাওয়া। মেবার অধিপতি মহারাণা প্রতাপের শৌর্য-বীর্য, সাহস ও স্বাভিমান, আর স্বাভিমান রক্ষার জন্য অসম্ভব কষ্ট স্বীকার করা—আজও বাঙালির মনকে নাড়া দেয়।

পনেরো শতাব্দীর ভারত। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে প্রায় গোটা ভারতজুড়ে। বিদেশী বর্বর ইসলামিক আক্রমণকারীদের কাছে মাথা নত করছে একের পর এক স্বাধীন হিন্দু রাজা। সেই সময় ১৫৫৬ সালে দিল্লির সিংহাসনে বসলেন চতুর মোগল বাদশাহ আকবর। তিনি যুদ্ধে নয়, কৌশলে বশ করলেন রাজস্থানের বীর রাজপুত রাজাদেরকে। বিশাল সেনাবাহিনীর অধিকারী অম্বরের রাজা মান সিং আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর অধীনে সেনাপতির পদ নিলেন। আকবর ৬ বার মহারাণা প্রতাপের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু প্রতাপ সিংহ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। মহারাণা প্রতাপের রক্তেই যে আলাদ! তাঁর ঠাকুর্দা রাণা সঙ্গ লড়েছেন তুর্কী হামলাকারী বাবরের সঙ্গে। তাঁর বাবা মহারাণা উদয় সিং আকবরের সঙ্গে লড়েছেন। তিনি মেবারের রাজধানী চিতোর ছেড়ে আরাবল্লী পর্বতের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন, তবু আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরই পুত্র মহারাণা প্রতাপ কী করে মোগলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন? সম্ভব নয়।

১৫৭৬ সালে হল হলদিঘাটের ঐতিহাসিক যুদ্ধ। রাণাপ্রতাপ পরাজিত হলেন। তবু বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তাঁর পিতাকে রাজধানী চিতোর ছাড়তে হয়েছিল। তাঁকে মেবার রাজ্য ছাড়তে হল। তিনি আরাবলী পর্বতের নীচে নতুন রাজধানী উদয়পুর বসিয়েছিলেন। প্রতাপ সিংহকে আশ্রয় নিতে হল আরাবলী পর্বতের জঙ্গলে। রাজ্য নেই, সিংহাসন নেই, রাজমুকুট নেই, স্বর্ণথালা নেই, রাজভোগ নেই। আছে বৃক্ষপাতার শয্যায় শয়ন, পাহাড়ী ঘাসের বীজের রুটি। আর আছে বনবাসী জনজাতি ভীল বন্ধুরা। একদিন রাণাপ্রতাপের ছোট্ট মেয়েটি ঘাস-বীজের রুটি খাচ্ছে। সেটাও টেনে নিয়ে গেল এক বনবিড়াল। সে কি অকল্পনীয় কষ্ট! বিশ্বের অতুলনীয় আত্মত্যাগ। শুধু মাথা উঁচু করে রাখার জন্য।

কারণ তাঁরা যে ক্ষত্রিয়! সূর্যবংশী ক্ষত্রিয়। তাঁদেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা ইক্ষ্বাকু রাজা হরিশচন্দ্র ও শ্রীরামচন্দ্র। এই বংশে সন্তানেরা ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়াকে তো ছোটছেলের খেলা মনে করেন। ধর্মরক্ষার জন্য রাজা হরিশচন্দ্রের ত্যাগ—তার কোন তুলনা আছে বিশ্বে? সেই বংশের সন্তান হয়ে ধর্মচ্যুত হবেন? রাণাপ্রতাপ? না, তিনি ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। বিদেশী আক্রমণকারীর কাছে মাথা নত করতে পারেন না। তাই আরাবলীর জঙ্গলে তাঁর এই কষ্ট স্বীকার। আবার সৈন্য যোগাড় করলেন। এবার তাঁর সাথী আরাবলীর পঞ্চাশ হাজার ভীলসৈন্য। ১৫৭৮ সালে আক্রমণ করলেন মোগল বাহিনীকে। চল্লিশ হাজার ভীল সৈন্য যুদ্ধে নিহত হল। কিন্তু এবার জিতলেন মহারাণা প্রতাপ। রাজধানী চিতোর ছাড়া বাকী মেবার রাজ্য মোগলের হাত থেকে মুক্ত করলেন।

সীতা-মাকে উদ্ধার করতে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল দক্ষিণ ভারতের জনজাতি বনের নর (বানর) বাহিনী। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রথম সেনাবাহিনী ছিল মাওলী বন্ধুদের নিয়ে গঠিত। আর রাণাপ্রতাপের মেবার উদ্ধারে সাথী ভীল বন্ধুরা।

সেই মহারাণা প্রতাপের ৪৭৫-তম জন্মতিথি এবার পড়েছে ২১শে মে ২০১৫। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে। এই দিনটিকে এবার হিন্দু সংহতি পালন করবে ''ক্ষাত্রশক্তি জাগরণ দিবস'' হিসাবে। বাংলার যে সকল জনগোষ্ঠী যুগে যুগে স্বাধীনতা ও স্বাভিমান রক্ষার জন্য লড়াই করেছে, হুগলীর বালিয়া বাসন্তী রাজ্যের সেই যোদ্ধারা, যশোরের রাজা

প্রতাপাদিত্যের সেই সাথীরা, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের রাজাদের সেই সেনাবাহিনী, কোচবিহারের বীর চিলা রায়ের সাথীরা, আরও অনেকে, এদের বংশধরদেরকে পূর্বপুরুষের বীর্যগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবার ক্ষাত্রশক্তিতে বলীয়ান করার সংকল্প হিন্দু সংহতির। তাই মহারাণা প্রতাপের এই জন্মতিথিকে এবার বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686